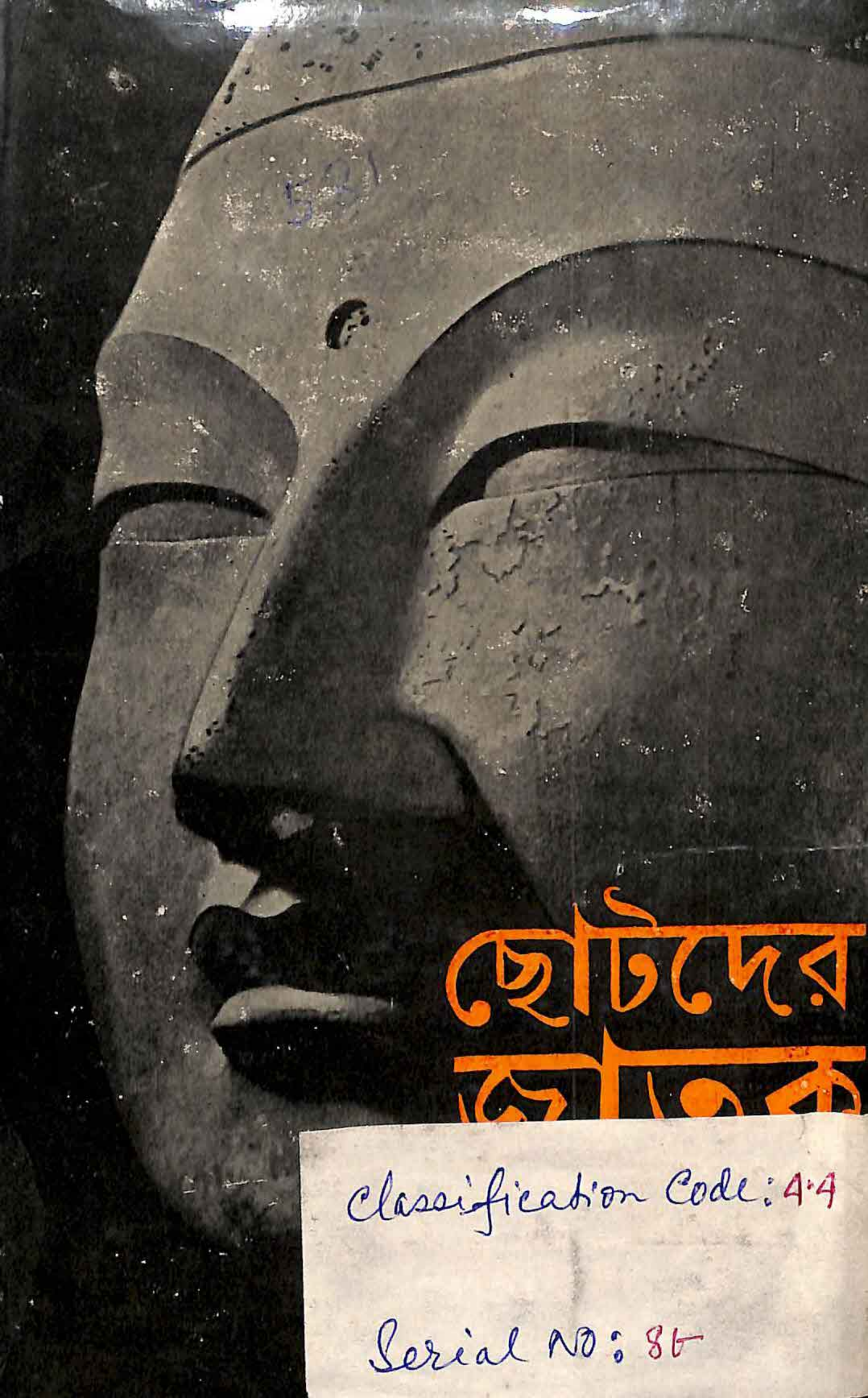

ছোটদের

ছোটদের জাতক কাহিনী

কৃষ্ণা সেন

শৈব্যা গ্রন্থন বিভাগ
৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
শ্রীতুলাল বল
৮/১এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

মূল্য : দশ টাকা মাত্র

মুদ্রাকর :
অসিত সরকার
তাপসী প্রিন্টিং ওয়ার্কস্
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলকাতা—৭০০০০৬

রাজকুমার সিদ্ধার্থ সিংহাসন ছেড়ে বনে গেলেন। নিলেন সন্ন্যাস। পরিব্রাজক। লাভ করলেন নির্বাণ। পৃথিবীতে তিনিপরিচিত হলেন বুদ্ধ বলে।

বুদ্ধদেবের মতানুসারী যাঁরা তাঁদের বলা হয় বৌদ্ধ। বৌদ্ধরা মনে করেন জাতকের গল্পের জাতকেরা হলো ভগবান গৌতম বুদ্ধদেবের অতীত জন্মবৃত্তান্ত। যখন তিনি বুদ্ধ হননি। তিনি তখন ছিলেন বোধিসত্ত্ব। বৌদ্ধরা গভীরভাবে বিশ্বাস করেন যে, কোন মানুষের পক্ষেই এক জন্মে গৌতম বুদ্ধের মত এমন সর্ববিদ্যা বিশারদ জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ হওয়া সম্ভব নয়। তাই বোধিসত্ত্ব নানা জন্মে নানা রূপ জন্মগ্রহণ করেন। দেবতা মানুষ পশু পাখি কীট পতঙ্গ বৃক্ষ থেকে শুরু করে একেবারে শেষে জন্মান রাজপুত্র সিদ্ধার্থ হয়ে। আড়াই হাজার বছর আগে। কপিলাবস্তু নগরীতে।

শুধুমাত্র শ্রুতিতে, লোকের মুখে মুখে প্রচারিত হয়েই শত শত বছর বেঁচেছিলো জাতকের গল্প। বোধিসত্ত্বের নানা জন্মের কাহিনী। এমনই চমকপ্রদ আর মানব উত্তরণধর্মী সেসব জন্মবৃত্তান্ত। অল্পকথায় এই হলো জাতক পরিচয়।

বইটি পড়ে সবার ভালো লাগলেই আমার সবচেয়ে বেশী আনন্দ হবে।

লেখক

১ [] চুল্লকশ্রেষ্ঠী জাতক []

প্রাচীনকালে বারাণসী নগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। সে সময় বোধিসত্ত্ব বনিকবংশে জন্মগ্রহণ করেন। বড় হয়ে তিনি শ্রেষ্ঠীপদে নিযুক্ত হন। 'চুল্লকশ্রেষ্ঠী' উপাধি ও লাভ করেন। এছাড়া তিনি ছিলেন পরম বিদ্বান ও বুদ্ধিমান। কোন কিছুর লক্ষণ দেখে তিনি শুভাশুভ গণনা করতে পারতেন।

একদিন সকালের কথা। তিনি যাচ্ছিলেন রাজার সঙ্গে দেখা করতে। পথের মাঝখানে বোধিসত্ত্ব একটি মরা ইঁদুর দেখতে পেলেন। তিনি তাকালেন সুনীল আকাশের দিকে। গণনা করলেন গ্রহনক্ষত্রের অবস্থান। নিজের মনেই বোধিসত্ত্ব বলে উঠলেন, "কেউ যদি বুদ্ধি করে মরা ইঁদুরটা তুলে নিয়ে যায়, সে ব্যবসা করে প্রচুর অর্থ উপার্জ্জন করবে।"

ভদ্রবংশের এক গরীব যুবক সেই সময় ওই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। বোধিসত্ত্বের কথা শুনে যুবকটি ভাবলো, "কখনও না জেনেশুনে কোন কথাতো ইনি বলেন না। মরা ইঁদুরটা নিয়ে গিয়ে দেখি কপাল ফেরে কিনা।" মরা ইঁদুরটা হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে চলতে লাগলো সেই যুবকটি।

এক দোকানদার তার পোষা বেড়ালের জন্য খাবার খুঁজছিলো। যুবকের কাছ থেকে এক পয়সা দিয়ে মরা ইঁদুরটা কিনলো সে। যুবক তখন সেই পয়সায় গুড় কিনলো। এক কলসী জল নিয়ে পথের ধারে বসলো। মালাকারেরা বন থেকে ফুল তুলে সে পথেই ফিরতো। ক্লান্ত পথশ্রান্ত মালাকারেরা যখন ফুলের বোঝা নিয়ে সেখানে এলো; যুবকটি তাদের সবাইকে যত্ন করে গুড় আর জল

খাওয়ালো। খুশী হয়ে মালাকারেরা তাকে এক মুঠো করে ফুল দিয়ে গেলো। সেই ফুল বেচে যুবকটি আরও বেশী গুড় কিনলো। ফুলের বাজারে গিয়ে সে আবার মালাকারদের গুড় আর জল খেতে দিলো। সেদিন মালাকারেরা তাকে অনেকগুলো ফুটন্ত ফুলের গাছ দিয়ে গেলো। ফুল আর ফুলগাছ বেচে ছু'চারদিনের মধ্যে যুবকটির আট কাহন পুঁজি হলো।

একদিন খুব ঝড়বৃষ্টি হলো। গাছ পড়ে আর ডালপালা ভেঙ্গে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেলো রাজার বাগান। মালী বেচারা ভেবে কূল-কিনারা পাচ্ছিলনা কেমন করে আবর্জ্জনা সরাবে। এমন সময় সেই যুবক মালীকে গিয়ে বললো, "যদি তুমি এসব আমাকে বিনা পয়সায় ছেড়ে দাও, তাহলে এখনই আমি বাগান পরিষ্কার করে দেবো।" মালী সানন্দে রাজী হলো সেই প্রস্তাবে। কাছেই খেলছিলো পাড়ার ছেলেরা। যুবকটি তাদের গুড় খেতে দিলো। বললো, "চলো—সবাই আমার সঙ্গে। রাজার বাগান পরিষ্কার করবো।"

গুড় খেয়ে খুশী মনেই ছেলেরা হৈ-হৈ করে বাগানের ডালপালা টেনে এনে পথের ধারে গাদা করে রাখলো।

সে দিন রাজার কুম্ভকারের কাঠের অনটন চলছিলো। সে কাঠের অভাবে হাঁড়ি কলসী পোড়াতে না পেরে কাঠের খোঁজে বেরিয়েছিলো। পথেই ডালের গাদা দেখতে পেলো। নগদ ষোল কাহন আর কয়েকটি মাটির হাঁড়ি দিয়ে যুবকের কাছ থেকে সব কিনে নিলো সে।

সমস্ত খরচখরচা বাদে যুবকের হাতে এইরূপে চব্বিশ কাহন জমলো। বারাণসীতে ছিলো পাঁচশো ঘেসেড়া। তারা প্রতিদিন মাঠ থেকে ঘাস কেটে আনতো। যুবকটি নগরের বাইরে এক স্থানে বড় বড় জালায় জল ভরে রাখলো। রোজ ঘেসেড়াদের পিপাসার সময় জল দিতে লাগলো। তেষ্টার জল পেয়ে ঘেসেড়ারা যুবককে

বললো, "আপনি আমাদের এত উপকার করছেন। বলুন, আপনার জন্য আমরা কি উপকার করতে পারি?" যুবক জানালো, "আরে, এত ব্যস্ত হচ্ছো কেন? যখন দরকার হবে তোমাদের ঠিক জানাবো।"

যুবকের সঙ্গে বন্ধুত্ব হলো এক স্থলপথ বণিক ও এক জলপথ-বণিকের সঙ্গে। কথায় কথায় একদিন স্থলপথ বণিক তাকে খবর দিলো, "বন্ধু কাল একজন অশ্ববিক্রেতা পাঁচশো ঘোড়া নিয়ে এ শহরে আসছে।" কথাটা শুনে যুবক গেলো ঘেসেড়াদের কাছে। তাদের বললো, "ভাই তোমরা সবাই কাল আমাকে এক আঁটি করে ঘাস দেবে আর আমার ঘাস বেচা শেষ না হলে তোমাদের ঘাস বেচবেনা কিন্তু—।" ঘেসেড়ারা কথা রাখলো। অশ্ববিক্রেতা আর কোথায়ও ঘাস না পেয়ে যুবকের কাছ থেকে হাজার কাহণ দামে পাঁচশো আঁটি ঘাস কিনতে বাধ্য হলো।

এ ঘটনার কয়েকদিন পরে যুবক জলপথ বণিকের কাছ থেকে খবর পেলো যে, একখানা বড় জাহাজ প্রচুর মালপত্র নিয়ে বন্দরে ভিড়েছে। যুবক সঙ্গে সঙ্গে ভাড়া করা গাড়িতে চড়ে মহাসমারোহে বন্দরে গেলো। দরদস্তুর ঠিক করে জাহাজের সমস্ত মাল বায়না করে ফেলে নিজের নামাঙ্কিত আংটির শীলমোহর ছাপ মেরে দিলো। সুন্দর তাঁবু খাটিয়ে তার ভিতর গিয়ে রইলো। লোকজনকে বলে দিলো, বণিকরা এলে এক একজনকে যেন তিনজন অনুচরের সংগে ভিতরে আনা হয়।

এদিকে বন্দরে মাল কিনতে এলো বারাণসীর একশো জন বনিক। যখন খবর পেলো কোন মহাজন নাকি একাই সব মাল বায়না করে রেখেছে, তখন খোঁজ করে সেই যুবকের তাঁবুতে এসে হাজির হলো তারা। যুবকের সুসজ্জিত শিবির, লোকজন, অনুচর আর চাকরবাকরের ঘটা দেখে স্তম্ভিত বনিকেরা ভাবলো যুবক অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী। বণিকেরা এক এক করে যুবকের সঙ্গে

দেখা করলো। তারা সবাই মালের এক এক অংশ পাওয়ার জন্য এক এক হাজার মুদ্রা লাভ দিতে রাজী হলো। এছাড়া যুবকের নিজের অংশ কিনে নিলো এক লক্ষ মুদ্রাতে। এইভাবে যুবক মোট দু' লক্ষ মুদ্রা লাভ করতে সমর্থ হলো। যুবক বারাণসীতে ফিরে গেলো ধনী হয়ে।

বোধিসত্ত্বের পরামর্শমত কাজ করেই যুবকের ভাগ্য ফিরলো। কৃতজ্ঞ যুবক একলক্ষ মুদ্রা বোধিসত্ত্বকে উপহার দিতে গেলো। বোধিসত্ত্ব জানতে চাইলেন, কী ভাবে সে এত অর্থ পেলো। যুবকটি তখন মরা ইঁদুর তুলে নেওয়া থেকে, যা কিছু ঘটেছিলো চার মাসের ভেতর সবই জানালো তাঁকে।

সব শুনে বোধিসত্ত্ব বিবেচনা করলেন, "ছেলেটি উদ্যোগী, পরিশ্রমী আর বুদ্ধিমান। ছেলেটি যাতে মন্দ লোকের হাতে না চলে যায় তার ব্যবস্থা করা দরকার।"

বোধিসত্ত্ব নিজে অগ্রণী হয়ে তাঁর প্রাপ্তবয়স্কা কন্যার সঙ্গে যুবকের বিয়ে দিলেন। তাঁর অন্য কোন সন্তান না থাকায় যুবকটিই তাঁর সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী হলো। যত তুচ্ছই হোকনা কেন, কখনও কোন জিনিষকে অবহেলা করতে নেই।

২ ☐ সেরিবাণিজ জাতক ☐

প্রাচীনকালে সেরিব নামে এক রাজ্য ছিলো। বোধিসত্ত্ব তখন ফেরিওয়ালা ছিলেন। তখন তাঁর নাম ছিলো সেরিবান। সেরিবা নামে আরও একজন ফেরিওয়ালা ছিলো। সে ছিলো ভীষণ লোভী আর অর্থপিশাচ।

একদিনের ঘটনা। বোধিসত্ত্ব সেরিবাকে সংগে নিয়ে অন্ধপুরনগরে

ফেরি করতে বেরিয়েছিলেন। সেখানে কে কোন রাস্তায় ফেরি করে বেড়াবে তা ভাগ করে নেওয়া হলো। কথা হলো একজন যে রাস্তায় একবার ফিরি করে গেছেন, অপরজন তার পরে সেখানেও ফেরি করতে পারবেন।

এদিকে লোভী ফেরিওয়ালা সেরিবা "চাই কলসী, চাই পুতুল—চাই খেলনা" হাঁক দিতে দিতে পুরোনো এক ভাঙ্গা বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো! এ বাড়ির লোকজনের মধ্যে আছেন বৃদ্ধা দিদিমা আর তাঁর একমাত্র বালিকা নাতনী। এক সময় এঁদের অবস্থা ছিলো খুবই ভালো। ধনী ব্যবসায়ী পরিবার ছিলেন এঁরা! পূর্বপুরুষ সোনার থালায় খেতেন। আজ অবশ্য লোকের বাড়িতে কাজ করে দিদিমা আর তার নাতনীর খাওয়া পরা চলে কোনরকমে। ফেরিওয়ালার হাঁক শুনে বালিকা বায়না ধরলো তাকে একটা পুতুল কিনে দিতে হবে। গরীব দিদিমার কাছে সামান্য পয়সাও ছিলোনা, যা দিয়ে নাতনীর সাধ পূরণ করা যায়। এদিকে বালিকা পুরোনো ছেঁড়া জিনিসপত্রের ভেতর থেকে একখানা বাসন বের করে আনলো। বাসনের বদলে যদি কোন জিনিস পাওয়া যায়। দিদিমা ও আপত্তি না করে ফেরিওয়ালাকে ডাকলেন। বাসনখানা দু'একবার উল্টেপাল্টে দেখেই সেরিবা ফেরিওয়ালার সন্দেহ হলো যে সম্ভবত বাসনখানা সোনার। দীর্ঘদিন অব্যবহৃত থাকায় ময়লা জমে জমে আর সোনা বলে মনে হতোনা। ধূর্ত সেরিবা নানারকম পরীক্ষা করে বুঝতে পারলো তার অনুমান ঠিক, বাসনটি সোনার তৈরী। কিন্তু বৃদ্ধা ও অবোধ বালিকাকে ঠকিয়ে বিনা পয়সায় বাসনটি হাতাবার ফন্দী আঁটলো সেরিবা। "দূর—দূর এর আবার দাম কি? সিকি পয়সায় কিনলেও লোকসান হয়।" সেরিবা অবজ্ঞা আর অবহেলার ভাণ করে বাসন রেখে চলে গেলো।

এর একটু পরেই বোধিসত্ব সেই পথে ফেরি করতে এলেন। "চাই কলসী—চাই কলসী" বলতে বলতে তিনি বাড়িবাড়ি ঘুরতে

লাগলেন। ফেরিওয়ালার হাঁক শুনে বালিকা পুনরায় বায়না ধরলো পুতুল কেনার। তখন বৃদ্ধা বোধিসত্ত্বকে ডেকে বাসনখানির বিনিময়ে মেয়েটিকে কিছু খেলনা দিতে অনুরোধ করলেন। বোধিসত্ত্ব বাসনটি দেখেই বুঝলেন ওখানা সোনার। তিনি বৃদ্ধাকে বললেন, ''মা, এ বাসনের দাম লক্ষ মুদ্রা। এত অর্থতো আমার কাছে হবেনা।'' "সে কি ? এইমাত্র আর একজন ফেরিওয়ালা বলে গেলো এর দাম এক সিকিও নয়। বোধহয় আপনার ছোঁয়াতেই এখানা সোনা হয়েছে। বাসনখানা আপনিই নিন। ছোট্ট মেয়েটাকে আপনার যা ইচ্ছা হয় দিন কিছু।"

ভদ্র অমায়িক ব্যবহারে বোধিসত্ত্ব তখন বললেন, "মা, আমার কাছে পাঁচশো কাহণ আছে। সংগে যা মালপত্র রয়েছে, তারও দাম হবে তাই। এ সবই আপনি নিন মা।"

বোধিসত্ত্ব শুধুমাত্র নগদ আট কাহণ, দাঁড়িপাল্লা আর টাকা রাখার থলেটা রেখে, বাকীসব বৃদ্ধাকে বুঝিয়ে দিলেন। দ্রুত পায়ে নদীতীরে এসে নৌকার মাঝিকে আট কাহণ পারানী দিয়ে নদী পারাপার করে দিতে বললেন।

এদিকে লোভী বণিক সেরিবা আবার ঘুরে এলো সেই বৃদ্ধার বাড়িতে। সামান্য কিছু দিয়ে থালাখানা নিতে আগ্রহ দেখালো, কিন্তু যখন বৃদ্ধার মুখে শুনলো এক হাজার কাহণ দিয়ে আর একজন সাধু ফেরিওয়ালা থালাখানা কিছুক্ষণ পূর্বে কিনে নিয়ে গেছে, তখন সে পাগলের মত হয়ে গেলো। শোকে দুঃখে সংগের জিনিসপত্র সব ফেলে, মুদ্রাগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রেখে, দাঁড়ি পাল্লাকে মুগুরের মত ঘোরাতে ঘোরাতে সে নদীর তীরে ছুটলো সেরিবানের খোঁজে। কিন্তু খেয়াঘাটে কোন নৌকা নেই। নৌকা তখন মাঝনদীতে চলে গেছে। উন্মত্তের মত চীৎকার করে উঠলো সেরিবা, "নৌকা ফেরাও! নৌকা ফেরাও! দুরাত্মা ছল করে আমার লক্ষ স্বুবর্ণ মুদ্রা নিয়ে যাচ্ছে।"

কিন্তু বোধিসত্ত্বের নিষেধে মাঝি নৌকা ফেরালোনা। আর ওদিকে প্রলাপ বকতে বকতে মুখে রক্ত উঠে মারা গেলো ধূর্ত সেরিবা। এদিকে বোধিসত্ত্ব দানধ্যান আর সৎকাজে কাটাতে লাগলেন তাঁর জীবন। এ জন্যই কথায় বলে অতি চালাকের গলায় দড়ি।'

৩ [] অপণ্ণক জাতক []

পুরাকালে বারাণসী নগরে ব্রহ্মদত্ত নামে এক রাজা ছিলেন। বোধিসত্ত্ব তখন বণিকের ঘরে জন্মেছিলেন। বড় হয়ে বোধিসত্ত্ব বাণিজ্য যাত্রা করতে মনস্থ করলেন। তাঁর ছিলো পাঁচশো গরুর গাড়ি। এসব গাড়িতে মালপত্র বোঝাই করে তিনি পূবে পশ্চিমে যেতেন ব্যবসা করতে।

তখন বারাণসীতে বোধিসত্ত্বের সমবয়সী আরও একজন তরুন ব্যবসায়ী ছিলো। সে ছিলো অপরিনামদর্শী। স্থূলবুদ্ধি সম্পন্ন।

একবার বোধিসত্ত্ব অনেক মূল্যবান জিনিসপত্র বোঝাই করে পাঁচশো গরুর গাড়িসহ দূরদেশের কোন এক শহরে কেনাবেচা করতে যাবেন ভাবলেন। এমন সময় খবর পেলেন, সেই নির্বোধ বণিকও নাকি পাঁচশো গরুর গাড়ি বোঝাই মালপত্র নিয়ে সেই একই শহরে যাবে বলে ঠিক করেছে। বোধিসত্ত্ব ভেবে দেখলেন যে দুজনের এক হাজার গরুর গাড়ি চলার দরুণ রাস্তাঘাট ভেঙে চুরে যাবে। তাছাড়া একসঙ্গে এক হাজার লোক আর দু'হাজার বলদের খাদ্যপানীয় সংগ্রহ করাও অসম্ভব হয়ে উঠবে। তার চেয়ে একজন আগে যাবে, অপরজন কিছুদিন পরে গেলেও তেমন কোন অসুবিধা হবেনা। মনে মনে এরকম সিদ্ধান্ত নিয়ে বোধিসত্ত্ব সেই বোকা-চালাক বণিকে ডেকে

সব বোঝালেন এবং বললেন, "আমাদের এক সংগে যাওয়া যখন উচিত নয়, তখন ভেবে দেখো তুমি আগে যাবে না পরে যাবে ?"

বোধিসত্ত্বের কথা শুনে বোকা বণিক ভাবলো, "আগে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ হবে। কারণ রাস্তাঘাট ভালো মিলবে। ভাঙ্গাচূরা থাকবে না। গাড়ি চালানোর ও সুবিধে হবে খুব। আমার বলদগুলোও বেছে বেছে ভালো ঘাস খেতে পারবে। আমাদের খাওয়ার জল, বাছা বাছা খাবার দাবার আর উৎকৃষ্ট ফলমূলেরও কোন অভাব হবেনা। স্নান ও পানের জন্য পরিষ্কার নির্মল জলও প্রচুর পাওয়া যাবে। এছাড়া যেটা আমার সবচাইতে বড় লাভ হবে তাহলো, আগে গেলে আমি আমার খুশীমত চড়াদামে মালপত্র বেচতে পারবো।" আনন্দে আটখানা হয়ে নির্বোধ বণিক বোধিসত্ত্বকে তার মতামত শুনিয়ে দিলো, "মহাশয় আমি ভেবে দেখলাম আমি আপনার আগেই যাত্রা করবো।" বোধিসত্ত্ব শুনে বললেন, "বেশ কথা, তুমিই প্রথমে রওনা হও। আমার তাতে কোন আপত্তি নেই।"

এদিকে বোধিসত্ত্ব মনে মনে ভাবলেন, শেষে রওনা দিলেই বরং সুবিধা। নির্বোধ বণিকের গাড়ির চাকাতে অসমান পাথুরে এবড়ো খেবড়ো পথটা সমান হবে। এর গাড়ির বলদেরা পাকা পাকা হলদে ঘাস খেয়ে গেলে বরঞ্চ তা থেকে পরে কচি পাতা বেরুবে আর আমার বলদগুলো ভালো করে ঘাস খেতে পাবে। পথে খাওয়ার জন্য টাটকা ফলমূল পাবো। পথে জলের অভাব হবেনা। নির্বোধ বণিক যাওয়ার সময় পথে যে সব কূপ খনন করে যাবে, আমরা সে সব কূপের জল ব্যবহার করতে পারবো। কেনাবেচার সময় দরদস্তুর করে অনর্থক হয়রান হতে হবেনা আমাকে। এ ব্যক্তি যে দ্রব্যের যে মূল্য নির্ধারণ করে যাবে তাতেই আমি ভালোভাবে কেনাবেচা করতে পারবো।"

অবশেষে নির্বোধ বণিকের যাত্রা হল শুরু। বেশ কয়েকদিন

পরে বণিকের দলবল এক নির্জন জনমানবশূন্য রুক্ষবন্ধ্যা প্রান্তরে এসে উপস্থিত হলো। নির্জন এ মরুপ্রান্তরে শুধু ধূ ধূ বালি ছাড়া আর কিছুই নজরে পড়ে না। এ মরুভূমি পার হওয়া ছিলো ভয়ংকর এককষ্টসাধ্য ব্যাপার। ষাট যোজনের ভেতর কোথায়ও এক ফোঁটা জলের চিহ্নমাত্র ছিলোনা। তাছাড়া আরও যেটা ভয়ের ব্যাপার ছিলো তা হলো, ওই মরুরাজ্য শাসন করতো যক্ষরা। পথ ভুলিয়ে ক্লান্তক্ষুধার্ত মানুষকে খেয়ে ফেলতো !

প্রথম আসা বণিকের লোকজনেরা মরুভূমিতে ঢোকার আগেই যথেষ্ট সাবধানতাসহকারে অনেকগুলো বড় বড় জলভর্তি জালা গাড়িতে তুলে নিয়েছিলো। যখন বণিকেরা মাঝ-মরুভূমিতে চলে এলো ; তখন মায়াবী যক্ষরাজ ভাবলো "এই নির্বোধ বণিককে যেভাবেই হোক বোঝাতে হবে যে শুধু শুধু জল বয়ে নিয়ে যাচ্ছে ওরা। অনর্থক গাড়িতে বোঝা বাড়িয়েছে। তা হলে এ বণিক সমস্ত জল ফেলে দেবে। আর যখন মানুষ-গরু সবাই জল পিপাসায় কাতর আর্তনাদ করে কাহিল হয়ে পড়বে, তখন আমরা অনায়াসেই এ সকল লোকের প্রাণনাশ করে মনের সুখে সুস্বাদু নরমাংস খেতে পাবো।"

যক্ষরাজ তখন দুরভিসন্ধি করে মায়াবলে একটি সুন্দর গরুর গাড়ি বানালো। দুটো তুষার শাদা ষাঁড় টানছিলো তা। ধনীলোকের মত দুর্মূল্য বেশভূষাতে সজ্জিত হয়ে যক্ষরাজকে দেখাচ্ছিলো সত্যিকারের একজন ভদ্রলোকের মত। মাথায় ছিলো শাদা আর নীল পদ্মের মালা। মাথার চুল ছিলো ভেজানো। জামাকাপড় ও জলসিক্ত। গাড়ির চাকাতে জল-বৃষ্টি আর কাদার দাগ। যেন প্রচুর বৃষ্টি আর জলকাদা ভেংগে গাড়ি চলেছে। কোমরে তলোয়ার। বুকে বর্ম। হাতে ঢাল। কাঁধে তীর-ধনুক ফেলে যক্ষরাজের গাড়ির সামনে পেছনে হেঁটে চলেছে দশ বারোজন অনুচর। এদেরও মাথার চুল আর জামাকাপড় ভেজা। পায়ে কাদামাখানো। পদ্মের ডাঁটি চিবুতে চিবুতে পথ চলছিলো এরা। মাথায় গুঁজেছিলো নীলপদ্ম।

সামনের দিক থেকে বাতাস বইছিলো। ধুলোবালি এড়াতে সেই নির্বোধ বণিক দলের সবার আগে চলছিলো সর্দারী করে। যক্ষরাজ বণিকের কাছাকাছি এসে এক পাশে সরিয়ে নিলো নিজের গাড়ি। বণিককে যাবার পথ ছেড়ে দিলো। মধুর মোলায়েম কণ্ঠস্বরে যক্ষরাজ বণিককে বললো, "মহাশয়, কোথা থেকে এলেন?" বণিক ও ততক্ষণে নিজের গাড়িটি রাস্তার একপাশে সরিয়ে রেখে উত্তর দিলো, "মহাশয়, আমরা বারাণসী থেকে আসছি। কিন্তু আপনারা কোত্থেকে আসছেন? আপনাদের মাথায় ও হাতে টাটকা জলপদ্ম দেখতে পাচ্ছি। আপনার অনুচরেরা পদ্মের ডাঁটা চিবোচ্ছে। আপনাদের জামাকাপড় ও দেখছি ভেজা। গাড়ির চাকাতে কাদায় কাদাময়। পথে কি বৃষ্টি হয়েছিল? আপনি আসার সময় পদ্মফুল ফুটে থাকা কোন দিঘী দেখেছেন কি?"

যক্ষরাজ উত্তর দিলো, "তা যা বলেছেন আপনি—ওই যে দূরে গাছপালা দেখতে পাচ্ছেন—ওখান থেকে আরম্ভ হয়েছে ঘন বন। আর জঙ্গলে জলের ছড়াছড়ি। অনেক পুকুর রয়েছে। তাছাড়া ওদিকে ঘোর বর্ষা চলছে। বৃষ্টি আর বৃষ্টি। তা আপনাদের দেখেই মনে হচ্ছে সওদাগর। সংগে প্রচুর মালপত্র ও রয়েছে দেখছি। ওই শেষের গাড়িটাকে যেন বলদেরা টানতেই পারছেনা। কি আছে ওতে?"

"জল। জল রয়েছে।" সসম্ভ্রমে উত্তর দিলো বণিক। "জল এনে ভালোই করেছিলেন। কারণ এতক্ষণতো জলের দারুণ প্রয়োজন ছিলো। তবে এখন আর জলের কোন দরকার হবেনা শ্রেষ্ঠীমহাশয়। এখন বরং জালার জল ফেলে দিন। শুধু শুধু বোঝা বাড়িয়ে রেখে কী লাভ। বোঝা হালকা হলে গাড়ি তাড়াতাড়ি চলবে—আচ্ছা, ঠিক আছে আপনারা এগোন তবে—আমরাও চলি। কথায় কথায় দেরী করে দিলাম—" যক্ষরাজ কথা না বাড়িয়ে ব্যস্ত সমস্তভাবে গাড়ি হাঁকিয়ে চলে গেলো।

এদিকে নির্বোধ বণিক অচেনা যক্ষ রাজের পরামর্শমতো জালা ভেঙ্গে সব জল ফেলে দিলো। খাওয়ার জন্যও সামান্য জল পর্য্যন্ত রাখলোনা। এম্নিভাবে বোঝা হালকা করে পথ চলতে লাগলো বণিকেরা। অনেক অনেক দূরের পথ পেরিয়ে গেলো। কিন্তু কোথায় ও জলের চিহ্ন আবিষ্কার করতে পারলোনা। পথশ্রমে আর ছাতিফাটা তৃষ্ণার পীড়নে কাহিল হয়ে পড়লো মানুষ ও জীবজন্তুরা। ক্রমে সূর্য পশ্চিমে আরও পশ্চিমে অস্ত গেলো। ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় অবসন্ন বণিকের দল অন্য কোন উপায় না দেখে বিশ্রামের জন্য থামলো। এদিকে অন্ধকার গভীর হলে একে একে জমায়েত হলো যক্ষরা। সমস্ত মানুষ ও গরুকে নির্বিচারে মেরে ফেললো। রক্তপান করে মাংসের ভুরিভোজে তৃপ্ত যক্ষরাজ ও তার অনুচরেরা নগরে ফিরে গেলো। এমনি করে সেই বনিকের দুর্মতি আর বুদ্ধির দোষে তার দলের সমস্ত লোকজন আর পশুগুলো বিনষ্ট হলো। শুধুমাত্র নির্জন সেই ধূ-ধূ মরুপ্রান্তরে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ে রইলো মানুষ ও পশুর শাদা শাদা কঙ্কাল। গরুর গাড়ি আর অন্যান্য জিনিসপত্র যেমন ছিলো ঠিক তেমনই পড়ে রইলো—কেউ ছুঁলোনা পর্য্যন্ত সে সব। শুধু নির্জন সেই মরুভূমিতে আর্তনাদ করা বাতাস, সোনালী বালুকা রাশি সব কিছুর সাক্ষী হয়ে রইলো।

এদিকে বোধিসত্ত্ব সেই নির্বোধ বণিকের যাত্রার প্রায় দেড়মাস পরে নিজের পাঁচশো গাড়ি নিয়ে বারাণসী থেকে যাত্রা শুরু করলেন। একসময়ে বোধিসত্ত্ব সেই নির্জন মরুপ্রান্তরে এসে পৌছালেন। তিনিও সাবধানতা অবলম্বন করে বড় বড় জালাভর্তি জল নিয়ে নিতে ভুললেন না। এছাড়া সংগের সব লোকজনকে মরুভূমি পারাপারের ভয়াবহতা সম্বন্ধে সাবধান করে দিয়ে বল্লেন, "তোমরা কেউ কখনও যেন ভুল করেও এক ফোঁটা জলের অপচয় করোনা। মরুভূমির কোন ফুল-ফল বা পাতা স্পর্শ করোনা, মরুভূমে অনেক বিষবৃক্ষ থাকে।"

যথারীতি বোধিসত্ত্ব যে মুহূর্তে মরুভূমির মাঝখামে এলেন ; ঠিক তখনই সেই যক্ষরাজ আগের মতই তার অনুচর নিয়ে মায়াবী বেশভূষায় সেজে বোধিসত্ত্বের গাড়ির সামনে এসে দাঁড়ালো। বোধিসত্ত্ব কিন্তু দেখেই বুঝলেন, "এ কখনই মানুষ হতে পারেনা। নিশ্চয় মায়াবী যক্ষ।" বোধিসত্ত্ব আরও ভাবলেন, "এ লোকের মাটিতে ছায়া পড়েনা—রক্তবর্ণ চোখ আর বড়ই উগ্র চেহারা চোখে পড়ছে—ব্যাপারটা সন্দেহজনক। লোকটার সংগের অনুচরদের খুবই হিংস্র আর লোভী দেখাচ্ছে। খুব সাবধান থাকতে হবে আমাদের।"

বোধিসত্ত্বের মনে আর কোন সন্দেহ রইলোনা। তিনি তখনই শঙ্কিত হলেন হয়তো সেই নির্বোধ বণিক এদের কথায় ভুলে জল ফেলে দিয়ে, এদের পেটে গেছে দলবলসহ। তিনি কঠোর গলায় ধমক দিলেন, "আমার সামনে থেকে এক্ষুণি দূর হয়ে যা তোরা। ভেবেছিস তোদের মিষ্ট কথায় ভুলবো। আমরা সওদাগর। নিজের চোখে জলাশয় না দেখে আমরা কখনও সঞ্চিত জল ফেলবোনা। নিজের ইচ্ছা আর বুদ্ধিতেই জল ফেলে গাড়ি হালকা করতে পারবো, কারুর পরামর্শ নেবার দরকার হবেনা।"

বোধিসত্ত্বের সংগে সুবিধে করতে না পেরে যক্ষরাজ বিফলমনোরথ হয়ে যক্ষপুরে ফিরে গেলো।

বোধিসত্ত্বের লোকেরা কিন্তু ভাবলো, শুধুশুধুই জলের ভারী বোঝা বয়ে চলেছে তারা। সামনেই যখন জল পাওয়া যাচ্ছে, তখন অনর্থক কী দরকার জল টানার। বোধিসত্ত্ব তখন সকলকে বুঝিয়ে বল্লেন, "লোকগুলো বললো, বৃষ্টি হচ্ছে। এক যোজন দূর থেকেও বৃষ্টির জলো হাওয়া টের পাওয়া যায়। কিন্তু আমরা তো ঠাণ্ডা বাতাস পাচ্ছিনা। যে মেঘে বৃষ্টি হয় ; এক যোজন দূর হতে সেই মেঘের কিনারা চোখে পড়ে। আর চার পাঁচ যোজন দূর থেকে বিদ্যুৎ চমকানো চোখে পড়ে। কম করে দু যোজন দূর থেকে মেঘের

গর্জন শোনা যায়—কিন্তু আমরা কেউ-ই মেঘ ডাকার আওয়াজ শুনতে পাইনি। একটু থেমে সবার দিকে চোখ বুলিয়ে নিয়ে বোধিসত্ত্ব পুনরায় বললেন, "তোমরা ভয় পাবে বলে এতক্ষণ বলিনি। কিন্তু এখন বলছি মন দিয়ে শোন। যে লোকগুলো আমাদের পরামর্শ দিতে এসেছিলো তারা মানুষ নয়। মানুষখেকো যক্ষ। আমরা জল ফেলে দিলে পথের ক্লান্তিতে ক্ষুধা তৃষ্ণায় যখন আধমরা হয়ে পড়বো তখন আমাদের মাংস পেটপুরে খাবার ফন্দী এঁটেছিলো শয়তানগুলো। আমার স্থির বিশ্বাস, আমার আগে আসা সেই বণিক এ যক্ষদের পেটেই গেছে এদের বিশ্বাস করে। তাই সাবধান, বিন্দুমাত্র জল যেন না ফেলা হয়। তোমরা শুধু দ্রুত এগিয়ে চলো সামনে।"

বেলা পড়ে গেলো। সন্ধ্যা নামলো। বোধিসত্ত্বের লোকেরা নির্ব্বোধ বণিকের পড়ে থাকা গাড়ীর কাছে এসেই থামলো! বোধিসত্ত্বের আদেশে সবাই বিশ্রামের জন্য তাঁবু ফেললো সেখানে। গাড়ি থেকে খুলে নেওয়া হল বলদ। শুরু হলো চাল ডাল সহযোগে খিচুড়ি রান্নার আয়োজন। গরুরা খেতে লাগল ভূষি, খড়, গুড় আর খোল। বিশ্রামের ফাঁকে চললো গল্প আর গান।

খাওয়া দাওয়া সেরে সবাই বিশ্রাম নিতে লাগলো। শুধু তরবারি হাতে প্রহরীরা সজাগ দৃষ্টিতে পাহারা দিয়ে চললো। অবশেষে রাত কেটে গেলো। ভোর হলো। আলো ফুটলো চতুর্দিকে।

সকালবেলা সবার নজরে এলো ইতস্ততঃ ছড়িয়ে থাকা অনেক-গুলো গাড়ি। প্রচুর মালপত্র। কংকাল-করোটি। সবাই বুঝতে পারলো গতদিনে বোধিসত্ত্বের কথামত না চললে তাদেরও কপালে এই দশা হতো। সবাই খুব দুঃখ পেলো নির্বোধ বণিকের দুর্ভাগ্যের কথা ভেবে।

বোধিসত্ত্ব গরুগুলোকে ভালো করে খাওয়ালেন। যেসব গাড়ি

পুরোনো হয়ে ভেঙ্গে গেছে; সেগুলো ফেলে নির্বোধ বনিকের ভাল ভাল গাড়ি গুলো বেছে নিলেন। নিজের সংগে যে সব অল্প দামী দ্রব্য ছিলো সেগুলো ফেলে দিয়ে তুলে নিলেন পড়ে থাকা মূল্যবান সব জিনিষ।

অবশেষে যাত্রা শেষ হলো। বোধিসত্ত্ব তাঁর দূর গন্তব্য শহরে গিয়ে পৌঁছালেন। তিন চার গুণ বেশী দামে সমস্ত পণ্য দ্রব্য বেচলেন সেখানে। পরে কাজের শেষে নিরাপদে স্বদেশে ফিরে গেলেন। পথে কোন বিপদ হলো না—দলের একজন লোকেরও প্রাণ গেলোনা। সবাই খুশী মনে দেশে ফিরতে পারলো বোধিসত্ত্বের বিচক্ষণতা ও দূরদর্শীতায়। কখনও কোন অজানা অচেনা লোকের কথাতে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে নেই।

৪ [] আম্র জাতক []

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব চণ্ডাল হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। বোধিসত্ত্ব নগরের বাইরে এক বড় চণ্ডাল গ্রামে থাকতেন। তিমি ছিলেন বিজ্ঞ ও সুপণ্ডিত। এমন মন্ত্র জানতেন তিনি যাতে অকালে আমগাছে আম ফলাতে পারতেন।

সকালে ঘুম থেকে উঠেই কাঁধে বাঁক নিয়ে তিনি গ্রাম ছেড়ে বেরিয়ে পড়তেন। দূরের গভীর বন জঙ্গলে যেতেন আম ফলাতে। সেখানে আমগাছ থেকে সাত হাত দূরে দাঁড়িয়ে তিনি মন্ত্র পড়তেন। আর মন্ত্রপড়া জল ছিটিয়ে দিতেন গাছের ডালে ডালে। সংগে সংগে ঝরে যেতো পুরানো পাতারা। শাখায় শাখায় কচি কিশলয় গজিয়ে উঠতো। আমের বোল ধরতো। দেখতে দেখতে আম বড় হতো। পরে সুগন্ধী বাতাসে আমোদিত হতো দশ দিক। আম পেকে

উঠতো। টুপটাপ করে বৃন্ত থেকে খসে পড়তো পাকা আম। সেই আম—যা ছিলো মন্ত্র জাত, তা হতো তেমনি মধুর আর রসালো। মনে হতো এ মাটির পৃথিবীতে হওয়া আম নয়, স্বর্গের আম্রকাননের ফসল। যা কিনা দেবতার ভোগে লাগে।

বোধিসত্ত্ব কুড়িয়ে নিতেন আম। বাঁকে আম বোঝাই করে বাড়ি ফিরতেন। নিজে খেতেন কিছু আম। বাকী আম বিক্রি করতেন হাটে বাজারে। এমনি করে সংসার চালাতেনতিনি।

এমন সময় বোধিসত্ত্বের কাছে এলো এক ব্রাহ্মণ কুমার। তক্ষশিলাতে দেশবিখ্যাত আচার্য্যদের কাছে সর্ব বিদ্যাতে পারদরশীতা অর্জন করেছিলো সে। সকল বিদ্যার্জন শেষে সেই ব্রাহ্মণ কুমার বেরিয়ে পড়েছিলো দেশ ভ্রমণে। অনেক দেশ ঘুরে সে এলো বোধিসত্ত্বের চণ্ডাল গ্রামে। শুনতে পেলো বোধিসত্ত্বের মহামন্ত্র শক্তির কথা অকালে আমফলানোর মন্ত্র শেখার জন্য সে থেকে গেলো বোধিসত্ত্বের গৃহে। প্রাণপণ যত্নে সে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা করতে লাগলো বোধিসত্ত্ব ও তাঁর স্ত্রীকে। সে কাঠ কেটে আনতো বন থেকে। ধান ভেনে চাল করতো। ধান সেদ্ধ করতো। রান্না করে দিতো। গুরু আর গুরুপত্নীর হাত পা ধোয়ার জল এনে দিতো দূরের ঝর্ণা থেকে। উঠে পড়ে লাগলো গুরুর মন জয় করার জন্য। বোধিসত্ত্ব তাঁর স্ত্রীকে একদিন বল্লেন, "বুঝলে বউ, এ বামুনের ছেলে আমার কাছ থেকে মন্ত্র শেখার জন্য এখানে আছে। কিন্তু এ মন্ত্র এর কাছে থাকবেনা। কারণ এই ছেলেটি আসলে অসৎ। ভীষণ অহংকারী অকৃতজ্ঞ যুবক।"

এমনিভাবে দিন কাটছিলো। বোধিসত্ত্বের এক ছেলে হলো। তখন ছেলে আর গুরুপত্নীকে সে খুব সেবা করলো। খুশী হলেন বোধিসত্ত্বের স্ত্রী। তিনি তাঁর স্বামীকে অনুরোধ করলেন যেন ব্রাহ্মণপুত্রকে মন্ত্র শিখিয়ে দেওয়া হয়।

তখন স্ত্রীর অনুরোধে বোধিসত্ত্ব সেই ব্রাহ্মণপুত্রকে মন্ত্র শিখিয়ে

দিলেন। আর বললেন, "বৎস—এই মহা মূল্যবান মন্ত্রের সাহায্যে তুমি প্রচূর অর্থ উপার্জন করবে। পাবে মান সম্মান সব কিছু। কিন্তু যদি কখনও রাজা বা মন্ত্রী তোমাকে তোমার আচার্য্যের নাম জিগ্যেস করেন, তখন যেন ভুলে ও আমার নাম গোপন করোনা। চণ্ডাল গুরুর নাম উচ্চারণ করতে যদি লজ্জা পাও বা ইচ্ছে করে ব্রাহ্মণ গুরুর কথা বল, তবে এ মন্ত্র হবে নিস্ফল। কোন ফল পাবেনা আর। মন্ত্র তোমাকে ছেড়ে চলে যাবে তখনই।"

"ছিঃ ছিঃ এ আপনি কি বলছেন গুরুদেব! আপনার পা ছুঁয়ে, এই আমি প্রতিজ্ঞা করছি, আপনার নাম কখনও গোপন করবোনা।" এ কথা বলে বোধিসত্ত্বকে প্রণাম করে ব্রাহ্মণ কুমার চণ্ডাল গ্রাম থেকে যাত্রা করলো। অবশেষে সে বারাণসীতে এসে উপস্থিত হলো জীবিকার খোঁজে।

বারাণসীতে আম বিক্রি করে বড়লোক হয়ে গেলো ব্রাহ্মণ যুবক। একদিন রাজার উদ্যানপাল ব্রাহ্মণের কাছ থেকে মন্ত্রজাত আম কিনে রাজাকে খাওয়ালো। রাজা খুবই খুশী হলেন। "এ আম তুমি কোত্থেকে কিনে আনলে?" "মহারাজ, সকালে একটা লোক রোজ এ আম বেচতে আসে এখানে। আমি তার কাছ থেকে কিনেছি।" "ঠিক আছে, এক কাজ করো। আজ থেকে সেই আমওয়ালা যেন সব আম এখানেই নিয়ে আসে।"

উদ্যানপালের কথা মত ব্রাহ্মণ সব আম রাজার কাছে বেচতে লাগলো। পরে রাজার সঙ্গে যোগাযোগ হওয়াতে সে ক্রমে হয়ে উঠলো পদস্থ রাজকর্মচারী আর রাজার খুবই বিশ্বাস ভাজন।

একদিন রাজা ব্রাহ্মণকে জিগ্যেস করলেন, "তুমি অকালে এত সুন্দর রংয়ের সুগন্ধ আর মধুর রসের আম কোথায় পাও বলতো? এসব আম কি তোমাকে দেবতা, নাগ বা সুপর্ণরা দেয়; না তোমার কোন মন্ত্র জানা আছে অকালে আম ফলাবার?" ব্রাহ্মণ উত্তর দিলো "মহারাজ, এ আম আমাকে কেউ দেয় না। আমি এক

অলৌকিক মন্ত্র জানি। সেই মহামন্ত্রের সাহায্যে আমি বারোমাস অমৃততুল্য আম ফলাতে পারি।"

"বেশ যদি তাই হয়—তবে আমি তোমার মন্ত্রের প্রভাব নিজের চোখে দেখতে চাই। আমাকে আম ফলিয়ে দেখাবে চলো। রাজা তাকে সংগে নিয়ে আম্রকাননে গেলেন। তখন সেই ব্রাহ্মণ মন্ত্রের ক্ষমতা দেখানোর জন্য আম গাছের সাত হাত দূরে গিয়ে দাঁড়ালো। মন্ত্র পড়লো। গাছের গায়ে মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে দিলো। দেখতে দেখতে গাছে কিছুক্ষণের মধ্যেই আগের মত নিয়মেই আম ফললো। পাকা আমের মিষ্টি গন্ধে ম-ম করে উঠলো বাতাস। রাজা ফল খেয়ে দারুণ সন্তুষ্ট হলেন। ব্রাহ্মণ যুবকের আলৌকিক ক্ষমতাতে খুশী হয়ে অনেক ধন দৌলত দান করলেন তাকে। রাজা তাকে জিগ্যেস করলেন, "ব্রাহ্মণ, এই মন্ত্র কার কাছে শিখলে তুমি? তোমার গুরুর নাম কি?" রাজার প্রশ্নে বিচলিত হলো ব্রাহ্মণ। চণ্ডাল গুরুর নাম মুখে নিতে লজ্জিত হলো। ভাবলো, এতো ভালো করে যে মন্ত্র আয়ত্ব হয়েছে—সেটা কখনই ভুলে যেতে পারেনা সে। সে তখন জানালো, "মহারাজ আমি এই মহামন্ত্র শিখেছি তক্ষশীলার এক বিখ্যাত আচার্য্যের কাছ থেকে।"

চণ্ডাল গুরুর নাম না করাতে মন্ত্র ব্রাহ্মণের কাছ থেকে চলে গেলো। কিন্তু জানলোনা লোভী অকৃতজ্ঞ ব্রাহ্মণ।

এর পরের ঘটনা। বেশ কিছুদিন কেটে গেলো। একদিন রাজার খুব আম খেতে ইচ্ছে হলো। তিনি তখন ডেকে পাঠালেন ব্রাহ্মণ পুত্রকে। সে এলে পরে তাকে নিয়ে আম্রকাননে গেলেন। রাজা হুকুম দিলেন, "ব্রাহ্মণ! আম ফলাও।" তখন সেই ব্রাহ্মণ পুত্র আম গাছের নিকটে এগিয়ে গেলো। সাত হাত দূরে দাঁড়িয়ে মন্ত্র পড়তে গিয়ে দেখলো, মন্ত্র আর মনে পড়ছে না, বেমালুম ভুলে গেছে সব। মনে পড়লো চণ্ডাল গুরুর শেষ কথা। ভেসে উঠলো গুরুর মুখ। লজ্জায় মাথা নিচু করে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সে। রাজা

যখন জিজ্ঞেস করলেন, আম ফলছে না কেন, তখন সে ব্রাহ্মণ বললো, "নক্ষত্র, মহূর্ত, যোগ শুভক্ষণ না পেলে আজ আর আম ফলাতে পারবো না।" রাজার কিন্তু সন্দেহ হলো খুব। তিনি কঠিন জেরা করে ব্রাহ্মণপুত্রের কাছ থেকে সব শুনে নিলেন। রাজা ভাবলেন, এই মূর্খ আর পাপিষ্ঠ ব্রাহ্মণ এত মহামূল্যবান মন্ত্র পেয়েও ধরে রাখতে পারে নি। যে গুরু এ রকম মন্ত্র শেখাতে পারেন তাঁর জাতে কি এসে যায়। তিনি হুকুম দিলেন, "এইমূহূর্তে তুমি আমার চোখের সামনে থেকে দূর হয়ে যাও। যাও, সেই গুরুর কাছে। যদি আবার মন্ত্রলাভ করতে পার তবেই এই বারাণসীতে পা রাখবে, নইলে নয়।"

সেই ব্রাহ্মণ তখন মনে মনে ভাবলো চণ্ডাল গুরু ছাড়া তার আর কোনও গতি নেই। আবার তাঁর কাছে যাবে। সেবাযত্ন দিয়ে তাঁকে খুশী করবে, প্রার্থনা করবে সেই মহামন্ত্র শেষ বারের মত।

এদিকে বোধিসত্ত্ব দূর থেকে ব্রাহ্মণ পুত্রকে আসতে দেখেই তাঁর স্ত্রীকে বললেন, "ঐ দেখ ঐ নীচ পাপাত্মা মন্ত্র হারিয়ে আবার এখানে এসে হাজির হয়েছে।" ব্রাহ্মণ যুবক আচার্য্যকে প্রণাম করে জানালো, "আচার্য্য, আমি মিথ্যে অহমিকায় আপনার নাম বলতে লজ্জা পেয়েছিলাম। মিথ্যে বলেছিলাম। আমার সর্বনাশ হয়েছে, মন্ত্র আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। আমাকে দয়া করে আবার সেই মন্ত্র শিখিয়ে দিন, আপনার পায়ে পড়ি।"

ব্রাহ্মণপুত্রের কথা শুনে বোধিসত্ত্ব শুধু বললেন, "যে অন্ধ, তাকেও সাবধান করেদিলে সে খানাখন্দ দেখে পথ চলে, আর তুমি তো চোখে দেখতে পাও। তার উপর আমি বারবার সাবধান করেছিলাম। যে দুর্লভ মন্ত্র তুমি নরজীবনে লাভ করেছিলে, অধর্মের পথে চলার দরুণই সে মন্ত্র চিরকালের মত তোমাকে ছেড়ে চলে গেছে। আর ফেরানো সম্ভব নয়। তুমি আমার সামনে থেকে দূর হয়ে যাও।"

এমনি করে চণ্ডাল গুরুর দ্বারা বিতাড়িত হয়ে লজ্জায় ঘৃনায় সেই ব্রাহ্মণযুবকে অবশেষে আত্মহত্যা করলো।

৫ [] নলপান-জাতক []

অতি প্রচীনকালে বারানসীরাজ্যের বাইরে এক নিবিড় অরণ্য ছিলো! অরণ্যের ভেতরে ছিলো টলটলে জলের বড় বড় দীঘি। সেই বনে ছিলো আশী হাজার বানর। বোধিসত্ত্ব সেই আশী হাজার বানর নিয়ে রাজার মত অরণ্যে বাস করতেন।

বোধিসত্ত্ব বানরদের শিখিয়েছিলেন, "ভায়েরা, এই বনে অনেক বিষবৃক্ষ আছে। আছে অনেক সরোবর! যার জলে থাকে উদক রাক্ষস। যারা ভালোবাসে বানরের মাংস খেতে। তাই সাবধান! আমাকে জিজ্ঞেস না করে কোনও অচেনা গাছের অজানা ফল মুখে দেবে না কেউ। যে সরোবরে জল কখনও খাও নি, ভুলেও সেই সরোবরের জল খাবে না!" বানরেরা সেই থেকে বোধিসত্ত্বের উপদেশ মেনে চলতো।

একদিন দুপুরবেলা। বানরেরা সবাই মিলে ফলমূল সংগ্রহ করতে বেরিয়েছে। সারাদিন খুঁজতে খুঁজতে তারা এক অচেনা সরোবরের তীরে এসে দাঁড়ালো। গাছে গাছে লাল টুকটুকে ফল ধরে আছে। কিন্তু বানরেরা না খেলো ফল; না ছুঁলো সরোবরের কাকচক্ষুজল। ওরা সবাই বোধিসত্ত্বের আসার অপেক্ষায় চুপ করে বসে রইলো।

বোধিসত্ত্ব আসার পর সবকথা শুনে সরোবরের চারিদিকটা ভাল করে দেখে নিয়ে বুঝলেন জীবজন্তুরা জল খেতে সরোবরে নেমে ছিল ঠিকই কিন্তু কেউই সরোবর থেকে উঠে আসে নি। সুতরাং ঐ সরোবরের বাসিন্দারা যে রাক্ষস এবং মাংসভোজী তাতে তাঁর কোনও সন্দেহ রইলো না। তখন তিনি বানরদের ডেকে বললেন,

"এই সরোবরের জলে না নেমে তোমরা বুদ্ধিমানের কাজ করেছো। এই সরোবরে রয়েছে হিংস্র রাক্ষসেরা।"

এদিকে উদক রাক্ষস দেখলো বানরেরা কেউই জলে নামছে না। তখন ভয়ংকর মূর্তি ধারণ করে সে জল থেকে উঠে এলো। উদক রাক্ষসের উদরের রং নীল, মুখের রং পাণ্ডুর, আর হাত পায়ের রং রক্তের মত টকটকে লাল। সে গলাকে মোলায়েম করার চেষ্টা করে বললো, "তোমরা এখানে বসে আছ কেন? জল তেষ্টা পেয়েছে তো সরোবরে নেমে জল খাও। দুই তীরের গাছ থেকে পেড়ে সুস্বাদু ফল খাও।" উদক রাক্ষসের কথা শুনে বোধিসত্ত্ব শুধু বললেন, "তুমি কি সরোবরে থাকো উদক রাক্ষস?" উদক রাক্ষস বললো "হ্যাঁ"।

"যারা এই জলে নামে তারা সকলেই কি তোমার খাদ্য?"

"হ্যাঁ, ঠিকই ধরেছ, ছোট ছোট পাখি থেকে বড় বড় চারপেয়ে জন্তু জলে নামলেই আমার হাত থেকে তার আর নিস্তার নেই! তোমাদেরও আমি মারবো। বানরের মাংস খেতে আমি বড় ভালবাসি। কতদিন খাইনি।"

"আমাদের তুমি কিছুতেই খেতে পারছো না।"

"একবার জল খেয়ে দেখ পারি কিনা!"

"আমরা জলও খাব, কিন্তু তুমি আমাদের কিছু করতে পারবে না।"

"তাই নাকি! দেখি তোমাদের বুকের পাটা, কেমন করে জল খাও?"

"তুমি ভাবছো, আমরা বুঝি জল খেতে বোকার মত জলে নামবো। আমরা কখনই জলে নামবো না। কিন্তু আমাদের আশী হাজার বানরেরা প্রত্যেকে এক একটা নল নেবো আর সেটা দিয়ে চুষে জল খাবো। আর একটু খোলসা করে তোমাকে বুঝিয়ে দিই, তোমার মাথা তো আবার মোটা। লোকে যেমন পদ্মের ডাঁটি দিয়ে জল চুষে

নেয়, আমরাও তেমন করে পদ্মের ডাঁটি দিয়ে জল চূষে খাবো, অথচ তুমি আমাদের ছুঁতে পারবে না।"

তারপর বোধিসত্ত্ব একটি নল আনলেন। বললেন, "আমি যদি দশ পারমিতা লাভ করে থাকি তবে এখানে যত নল আছে সব নল গ্রন্থি ছাড়া সমান ভাবে সচ্ছিদ্র হোক।" একথা বলে তিনি সরোবরের চারপাশে ঘুরলেন। সেই থেকে মহাত্মা বোধিসত্ত্বের আদেশে যত নল জন্মে সবই শুরু থেকে শেষ পর্য্যন্ত এক ছিদ্রের হয়!

বোধিসত্ত্ব একটি নল হাতে নিয়ে সরোবরের ধারে গেলেন এবং নল দিয়ে চুষে জল খেতে লাগলেন। বোধিসত্ত্বের দেখাদেখি সবাই নল দিয়ে টেনে জল খেয়ে নিলো। কাউকেই জলে নামতে হলো না। উদক রাক্ষসও একটি প্রাণীকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করতে পারলো না! রাগে অন্ধ হয়ে সে আবার জলের অতলে ডুবে গেলো। বোধিসত্ত্বও নিজের দলবল নিয়ে গভীর অরণ্যে চলেগেলেন ফলমূল খুঁজতে।

৬ [] কুক্কুর-জাতক []

পুরাকালে বারাণসীতে রাজত্ব করতেন ব্রহ্মদত্ত। বোধিসত্ত্ব তখন ছিলেন কুকুর। আড়াইশো কুকুরের দলপতি হয়ে তিনি একনির্জন মহাশ্মশানে বাস করতেন।

একদিন রাজা সিন্ধুদেশ থেকে আনা শাদা ঘোড়া আর সোনা দিয়ে কারুকাজ করা রথে আরোহণ করে উদ্যান ভ্রমণে বেরিয়েছিলেন। সমস্ত দিন সেখানে থেকে, সূর্য ডোবার পর তিনি ফিরে এলেন নগরে। রথের যে সমস্ত চামড়ার তৈরী সাজসজ্জা ছিলো, সেসব রাত হয়ে যাওয়াতে কেউ আর খুলে রাখলো না। সমস্ত সাজসজ্জা রথেই পড়ে রইলো। এদিকে রাতে নামলো প্রচণ্ড বৃষ্টি।

সাজগুলো গেলো ভিজে। রাজার কুকুরেরা ক্ষিদে পাওয়াতে দোতলা থেকে নেমে এসে সমস্ত চামড়ার সাজসরঞ্জাম খেয়ে ফেললো। পরদিন রাজার চাকরেরা সাজসরঞ্জাম তুলে রাখতে এসে দেখলো সব কুকুরে খেয়ে ফেলেছে। একথা রাজাকে জানালো! তারা ধরেই নিলো নর্দমার মুখ দিয়ে বাইরের কুকুর ভিতরে ঢুকেছিল, তারাই সব খেয়ে গেছে। রাস্তার কুকুরেরা রাজভবনে ঢুকে কুকুরের সাজ খেয়েছে। শুনে, রাজা রেগে গিয়ে হুকুম দিলেন সব কুকুর মেরে ফেলতে। রাজার লোকেরা যেখানে যত কুকুর দেখলো, মারতে লাগলো। সারা দেশে এক ভয়ংকর কুকুর হত্যা যজ্ঞ শুরু হলো। হাজারে হাজারে কুকুর লোহার মুগুরের বাড়ি খেয়ে মারা পড়তে লাগলো।

কুকুরেরা ভীত হয়ে সবাই মিলে বোধিসত্ত্বের কাছে গেলো। তাঁকে সব কথা খুলে বললো। সব শুনে বোধিসত্ত্ব বুঝলেন, রাজার পালিত কুকুরেরাই প্রকৃত অপরাধী। অথচ তারা নির্ভয়ে আছে। আর যারা নিরপরাধ তারা মারা যাচ্ছে নির্মমভাবে। রাজাকে আসল অপরাধীকে চিনিয়ে দিয়ে স্বজাতি কুকুরদের প্রাণরক্ষা করতে হবে। বোধিসত্ত্ব তখন কুকুরদের বললেন, "তোমাদের ভয় নেই। আমিই তোমাদের রক্ষা করবো। আমি রাজার কাছ থেকে ফিরে আসা না পর্য্যন্ত তোমরা অপেক্ষা করবে। আমি রাজার কাছে যাচ্ছি।"

বোধিসত্ত্ব তাঁর অলৌকিক প্রভাবকে জাগ্রত করে রাস্তা দিয়ে চললেন। তাই তাঁকে দেখে কেউই তেড়ে এলো না লাঠি নিয়ে। রাজসভায় সিংহাসনে বসে ছিলেন রাজা। বোধিসত্ত্ব রাজসভাতে ঢুকে রাজার সিংহাসনের নীচে ঢুকে পড়লেন। রাজার চাকরেরা হৈ হৈ করতে করতে লাঠিসোটা নিয়ে বোধিসত্ত্বকে তাড়াতে গেল! কিন্তু রাজা তাদের নিষেধ করেলন। রাজার ভরসা পেয়ে বোধিসত্ত্ব বেরিয়ে এলেন সবার সামনে। রাজাকে প্রণাম করে বললেন, "মহারাজ! কুকুরদের কি অপরাধ? তাদের মেরে ফেলতে আদেশ দিয়েছেন কেন?"

"কুকুরেরা ভয়ানক পাজি! তাদের এত সাহস যে আমার রথের চামড়ার সাজসরঞ্জাম খেয়ে ফেলে?"

"কোন কুকুরে খেয়েছে সেটা জেনেছেন কি?"

"না সেটা আমি জানি নে।"

"মহারাজ, যদি প্রকৃত অপরাধীকে না চেনেন, তবে কুকুর দেখলেই মারতে হবে এরকম করা কি ঠিক? আপনার লোক সব কুকুরই মারছে না বেছে বেছে মারছে?"

"সব কুকুরকেই মারতে নির্দেশ দিয়েছি, শুধুমাত্র আমার পোষা কুকুদের মারা চলবে না, ওরা অবধ্য।

বোধিসত্ব একথা শুনে বললেন, "আপনার পালিত কুকুরকে মারা হবে না, অথচ অন্য সব কুকুরকে মারা হবে, অথচ কোন কুকুর চামড়ার সাজসরঞ্জাম খেয়েছে তাও জানেন না—এটা আপনার ভয়ানক অধর্ম হচ্ছে। ন্যায়বিরুদ্ধ কাজ হচ্ছে। আপনার প্রসাদের পালিত কুকুরেরাই প্রকৃত অপরাধী। আমি তার প্রমাণ দিতে পারি। আপনি কুকুরগুলোকে আনতে নির্দেশ দিন। আর আনতে বলুন একটু ঘোল আর কিছু কুশ!"

বোধিসত্ব সমস্ত কুকুরকে ঘোলের সরবতের সঙ্গে কুশ মিশিয়ে কুকুরদের খাওয়াতে বললেন। কুকুরেরা বমি করতে শুরু করলো। বমির সঙ্গে পাওয়া গেল গলিত চামড়ার টুকরোগুলো। রাজা খুশী হয়ে বোধিসত্ব ও তাঁর কুকুরদের প্রতিদিন রাজভোগের ব্যবস্থা করে দিলেন। সেই থেকে আনন্দে দিন কাটাতে লাগলেন বোধিসত্ব তাঁর সঙ্গীদের নিয়ে।

৭ [] বেদম্ভ-জাতক []

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তর সময় এক গ্রামে বেদম্ভ মন্ত্রজ্ঞ এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁর ছিলো এক অলৌকিক মন্ত্রশক্তি। বিশেষ নক্ষত্রযোগে তিনি ঐ মন্ত্র পড়ে আকাশের দিকে তাকালেই ধনরত্নের বৃষ্টি হতো। আকাশ থেকে ঝরে পড়তো সোনা, রূপো, মণিমুক্তো, হীরে, প্রবাল আর দুর্মূল্য বৈদূর্য্যমণি। বোধিসত্ব এই ব্রাহ্মণের বাড়িতে শিষ্য হয়ে থাকতেন পড়াশোনা শেখার জন্য। একদিন একটি বিশেষ কাজে ব্রাহ্মণ আর বোধিসত্ব পাশের এক রাজ্যে যাচ্ছিলেন। ঘন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে ছিল পথ। সেই বনে প্রেষণক গোষ্ঠীর পাঁচশো ডাকাত বাস করতো। দস্যুতাই ছিলো এদের পেশা। এদের নিয়ম ছিলো যদি দুজন লোককে ধরতো, তবে একজনকে বেঁধে রাখতো আর একজনকে ছেড়ে দিতো বাড়ি থেকে টাকাকড়ি নিয়ে আসার জন্য। টাকাকড়ি নিয়ে এলে যাকে বেঁধে রাখতো সে মুক্তি পেতো। ব্রাহ্মণ ও বোধিসত্ব এই ডাকাতদের হাতে ধরা পড়লো। ডাকাতরা তাদের নিয়মমত ব্রাহ্মণকে আটকে রেখে, বোধিসত্বকে ছেড়ে দিলো টাকা পয়সা নিয়ে এসে ব্রাহ্মণকে মুক্ত করার জন্য। বোধিসত্ব যাওয়ার আগে গুরুকে প্রণাম করে বললেন, "গুরুদেব আপনি চিন্তা করবেন না, আমি যত তাড়াতাড়ি পারি ফিরে আসবো। আপনি যেন ভুলেও রত্নবর্ষণের মন্ত্র পড়তে যাবেন না। আজ কিন্তু রত্নবৃষ্টির যোগ রয়েছে। রত্নবৃষ্টি ঘটালেই আপনি আর এই পাঁচশো ডাকাত সবাই মারা পড়বেন।" বোধিসত্ব চলে গেলেন অর্থ আনতে।

সন্ধ্যাবেলা। বটগাছের নীচে হাত পা বাঁধা অবস্থায় ব্রাহ্মণ আকাশের পূর্ণ চাঁদ আর নক্ষত্রের অবস্থান দেখে বুঝতে পারলেন রত্ন-বৃষ্টির যোগ উপস্থিত। ব্রাহ্মণ ভাবলেন, মিছিমিছি এত কষ্ট করি কেন? তিনি ডাকাতদের ডেকে বললেন, তোমরা তো ধনরত্ন চাও, তাই

না? তাহলে এক্ষুনি আমাকে স্নান করিয়ে নতুন কাপড় পরতে দাও। সুগন্ধি চন্দন আর ফুলের মালা এনে দাও। আমি তোমাদের প্রচুর ধনরত্ন এনে দিচ্ছি। ডাকাতেরা ব্রাহ্মণের কথানুযায়ী কাজ করলো। তারা ব্রাহ্মণকে একা থাকবার সুযোগ দিয়ে দূরে গিয়ে অপেক্ষা করলো। ব্রাহ্মণ তখনি রত্নবর্ষণের মন্ত্র আওড়ালেন আকাশের দিকে তাকিয়ে। আকাশে মেঘ করলো। তা থেকে রাশি রাশি ধনবৃষ্টি হলো। ডাকাতেরা ধুতি চাদর ভর্তি করে ধন বেঁধে নিলো। খুশী মনে যাত্রা করলো নিজেদের বাড়ির দিকে। ব্রাহ্মণও তাদের পেছনে পেছনে চললেন।

এদিকে চলার পথে আরও পাঁচশো ডাকাত এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো প্রেষণক-ডাকাতদের ওপর। প্রথম দলের ডাকাতেরা বললো, "যদি ধনরত্ন পেতে চাও তবে এই ব্রাহ্মণকে ধর। ব্রাহ্মণ আকাশের দিকে তাকালেই রত্নবৃষ্টি হবে। আমাদের কাছে যত ধন আছে সব তিনিই দিয়েছেন।" নতুন ডাকাতেরা ব্রাহ্মণকে ধরলো। চেঁচিয়ে হুমকি দিলো ধনরত্ন দেওয়ার জন্য। ব্রাহ্মণ বললেন, "দেখ, ধনরত্ন দিতে তোমাদের কিছু মাত্র আপত্তি আমার নেই। কিন্তু গ্রহরত্নের যে যোগে রত্নবর্ষণ হয় সে যোগ এবছরে আর নেই, আবার আগামী বছরে ঘুরে আসবে। তোমরা একবছর অপেক্ষা কর, আমি তোমাদের জন্য রত্নবর্ষণ করবো। দ্বিতীয় দলের ডাকাত সর্দার একথা শুনে প্রচণ্ড রেগে গেলো। "তবে রে ধূর্ত বামুন। তুমি এই মাত্র এই প্রেষণক ডাকাদের ধনরত্ন দিলে, আর আমাদের বেলায় বলছো এক বছর অপেক্ষা করতে।" রেগে গিয়ে তলোয়ারের এক কোপে ব্রাহ্মণের মাথা কেটে ফেললো তারা। দ্রুত পিছু নিয়ে ধরে ফেললো প্রথম ডাকাতদলকে। দুই ডাকাতদলে প্রচণ্ড মারামারি শুরু হলো। যুদ্ধে দ্বিতীয় দলের জয় হলো। সব ধনরত্ন লুঠ করলো তারা। কিন্তু লুঠের বখরা নিয়ে নিজেদের মধ্যেই মারামারি কাটাকাটি শুরু হলো। দু'জন ছাড়া আর সবাই মারা গেলো। একজন যখন সমস্ত ধনরত্ন পাহারা

দিচ্ছিলো তখন আর একজন গ্রামে গেলো চালডাল জোগাড় করে আনতে। খেয়েদেয়ে ধনরত্ন ভাগ হবে একরকম ঠিক হয়েছিলো। এদিকে যে লোক পাহারা দিচ্ছিলো সে ভাবলো প্রথম ডাকাত গ্রাম থেকে ফিরলেই আমি তার মাথা কেটে ফেলবো। সব ধনরত্ন একাই নিয়ে নেবো। অপরদিকে যে গ্রামে গেলো সে ডাকত মনে মনে ভাবলো "আমি নিজেই সব ধনরত্ন নেব।" এই ভেবে সে নিজে ভাত রেঁধে খেলো। বাকি ভাতে কড়া বিষ মেশালো। পরে সেই বিষ মেশানো ভাত এনে যেই অন্য ডাকাতের সামনে রাখলো, তখনই অপর ডাকাতের তরোয়ালের কোপে তার মাথা কাটা পড়লো। মনে মনে সে ডাকাত ভাবলো, এখন সব ধনরত্ন তার একার। জঙ্গলের গোপন জায়গাতে ধনরত্ন পুঁতে রেখে তার জন্য আনা ভাত খেতে বসলো। সঙ্গে সঙ্গেই তীব্র বিষে মৃত্যু হলো তার। এম্নি করে দু ডাকাত পাশাপাশি মরে পড়ে রইলো।

এদিকে বোধিসত্ত্বের কথামত দু'তিন দিন পরে ফিরে এসে দেখলেন ব্রাহ্মণ আর হাজার ডাকাত মরে পড়ে আছে। তিনি বুঝতে পারলেন তার গুরুদেব নিজের বিদ্যে জাহির করতে গিয়ে প্রাণে মারা পড়লেন। আর ডাকাতরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করেই মারা পড়লো। বোধিসত্ত্বের কথা না শুনে নিজের স্বার্থ দেখতে গিয়ে ব্রাহ্মণেরও অকালমৃত্যু হলো। একটু তফাতেই বোধিসত্ত্ব আলাদা জায়গাতে আর এক ডাকাতের মৃতদেহ দিখণ্ডিত অবস্থায় দেখতে পেলেন। কাছেই একটি ভাতের থালা। এবং অন্য ডাকাতকেও পাশেই মৃত অবস্থায় দেখতে পেলেন। একটু অনুসন্ধান করতেই তিনি ডাকাতের হাতে পোঁতা সমস্ত ধনরত্ন মাটির নীচ থেকে খুঁড়ে বের করলেন। বোধিসত্ত্ব তখন সমস্ত ধনরত্ন নিজের বাড়িতে নিয়ে গেলেন। দীনদুঃখীর সেবায় সব ধনরত্ন খরচ করতে লাগলেন। বেশি লোভ করতে গিয়ে এম্নিভাবে হাজার ডাকাত মারা পড়লো নিজেদের মধ্যে মারামারি করে। কখনও লোভের চাকর হতে নেই।

৮ [] কুদ্দাল-জাতক []

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব পর্ণিককুলে জন্মেছিলেন। বড় হয়ে তাঁর নাম হলো কুদ্দাল পণ্ডিত। তিনি কোদাল দিয়ে জমি পরিষ্কার করে তাতে মাটি কুপিয়ে শাক, লাউ, কুমড়ো শশা, আলু, বেগুন প্রভৃতির চাষ করতেন। আর সেগুলো বিক্রি করেই পেট চালাতেন। সংসারে সেই একটি কোদাল ছাড়া তাঁর অন্য কোনও সম্বল ছিলোনা। অতি কষ্টে তরিতরকারী বেচে বোধিসত্ত্বের দিন চলতো। এভাবে থাকার কষ্ট সহ্য করতে না পেরে তিনি ভাবলেন, "বাড়ীতে থেকেই বা আমার কি সুখ ? আমি সংসার ছেড়ে বনে যাবো, সন্ন্যাসী হবো !" তিনি সব কিছু অবহেলায় ফেলে রেখে শুধু কোদালটা ঘরের এক কোনে লুকিয়ে রেখে রাতের অন্ধকারে বাড়ি ছেড়ে চলে গেলেন। কিন্তু কিছুতেই সেই কোদালের মায়া ত্যাগ করতে পারলেন না তিনি। পুনরায় সংসারে ফিরে এলেন। এমনি ভাবে বারবার ছ'বার তিনি কোদাল লুকিয়ে রেখে সংসার ছেড়ে সাধু হলেন আর ছ'বারই বন ছেড়ে সাধুগিরি ছেড়ে পুনরায় কোদালের টানে বাড়ি ফিরে এলেন।

সাতবারের বার বোধিসত্ত্ব সংসার ছেড়ে বনে যাবার সময় কোদালটাকে মাথার উপর ঘুরিয়ে নিয়ে নদীর জলে ফেলে দিলেন। "এবারে আমি জিতেছি, এবারে আমি জিতেছি" বলে তিনবার প্রচণ্ড জোরে চীৎকার করে উঠলেন।

রাজা তখন বারাণসী রাজ্যের প্রত্যন্তবাসী বিদ্রোহী প্রজাদের দমন করে রাজধানীতে ফিরছিলেন। রাজা সেই সময় নদীতে চান সেরে বস্ত্রালঙ্কার পরে হাতির পিঠে চড়ে নদীর তীর ধরে এগোচ্ছিলেন।

এমন সময় বোধিসত্ত্বের চীৎকার তিনি শুনতে পেলেন। তিনি আদেশ করলেন, "যে লোকটা চীৎকার করছে "জিতেছি, জিতেছি" বলে তাকে আমার কাছে ধরে নিয়ে এসো।" বোধিসত্ত্বকে রাজার কাছে আনা হলো। রাজা জিজ্ঞেস করলেন আমি যুদ্ধে জয়ী হয়ে শত্রু দমন করে রাজধানীতে ফিরছি। তুমি কোন্ যুদ্ধে জয়ী হলে?" তখন বোধিসত্ত্ব বললেন, "মহারাজ, মনের গভীরে লুকিয়ে থাকা রিপুদের জয় করতে না পারা যায় তবে হাজার হাজার লাখ লাখ যুদ্ধেও জয়লাভ করা বৃথা। আমি আজ লোভ দমন করে রিপু জয় করেছি।" একথা বলতে বলতে তিনি তাকিয়ে রইলেন নদীর দিকে। তিনি হয়ে উঠলেন জ্ঞানে তত্ত্বদর্শী। তাঁর জন্মালো অলৌকিক ক্ষমতা। তিনি আকাশে উঠে গিয়ে রাজাকে ধর্মোপদেশ দিলেন। বোধিসত্ত্বের উপদেশে রাজার চৈতন্য ফিরে এলো। তিনি ঠিক করলেন সন্ন্যাসী হবেন। তখন রাজা, অন্যান্য পাত্রমিত্র এবং সমস্ত বারাণসীবাসীরা কুদ্দাল পণ্ডিতের প্রভাবে হিমাচলের দিকে চললো তপস্যার জন্য। এমনিভাবে দ্বাদশ যোজন দীর্ঘ জনস্রোত বোধিসত্ত্বের সঙ্গে হিমাচলে প্রবেশ করলো।

এসব দেখে দেবরাজ শক্রর আসন টলে উঠলো। তিনি বিশ্বকর্মাকে আদেশ দিলেন কুদ্দাল পণ্ডিতের সঙ্গের লোকেদের জন্য এক বিশাল আশ্রম নির্মাণ করার জন্য। বিশ্বকর্মা সে আদেশ পালন করলেন। নির্মিত হল পর্ণশালা। কুদ্দাল পণ্ডিত এবং তাঁর অনুগামীরা সন্ন্যাস ধর্ম নিয়ে সেই তিরিশ যোজন দীর্ঘ আশ্রমে দিন কাটাতে লাগলেন। কুদ্দাল পণ্ডিত তাদের ধর্ম শিক্ষা দিতে লাগলেন। কখনও লোভের দাস হতে নেই।

৯ [] সত্যংকিল-জাতক []

বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্তের এক ছেলের নাম ছিলো দুষ্টকুমার তার স্বভাব ছিলো অতিশয় নীচ। সে ছিলো সাপের মত খল গালাগালি ও মারামারিতে তার জুড়ি ছিলো না। একদিন দুষ্টকুমার অনেক চাকর বাকর-সঙ্গে নিয়ে নদীতে স্নান করতে গেল। সকলে যখন স্নানে মত্ত তখন ঝড় উঠলো। চারিদিক অন্ধকারে ডুবে গেলো। দুষ্টকুমার চাকরদের বললো, তাকে নদীর মাঝখানে নিয়ে যেতে এবং সেখান থেকে তাকে স্নান করিয়ে আনতে। চাকরেরা মনে মনে ঠিক করলো, তারা নদীর মাঝখানে গিয়ে পাপিষ্ঠ দুষ্টকুমারকে জলে ফেলে দেবে। করলোও তাই। রাজকুমারকে নদীর মাঝখানে জলে ফেলে দিয়ে তারা রাজবাড়ীতে ফিরে এলো। রাজা কুমারের কথা জিজ্ঞেস করলে চাকরেরা বললো কুমার নাকি আগেই স্নান করে ফিরে এসেছে। রাজা তন্নতন্ন করে নদী তীরে খোঁজ নিলেন, কিন্তু কোথাও তাকে দেখতে পেলেন না। এদিকে কুমার অন্ধকারে জলে ভাসতে ভাসতে একটা গাছের গুঁড়িতে আশ্রয় নিলো। মৃত্যুভয়ে "বাঁচাও, বাঁচাও" বলে চীৎকার করতে লাগলো।

ভাসমান গাছের গুঁড়িতে রাজপুত্রের আরও তিনটে সঙ্গী জুটলো। একটি সাপ, একটি ইঁদুর, একটি শুকপাখি। বারাণসীর এক ধনী বণিক ঐ নদীর ধারে চল্লিশকোটি স্বর্ণমুদ্রা পুঁতে রেখেছিলো। অত্যধিক অর্থলোভের জন্য সে মরার পরও সাপ হয়ে তার জমানো টাকা পাহারা দিচ্ছিলো। সে থাকতো ঐ গুপ্তধনের কাছেই একটি গর্তে।

এমনি করে আর একজন বণিক সেও পুঁতে রেখেছিলো তিরিশ

কোটি স্বর্ণমুদ্রা। প্রবল এই ধনতৃষ্ণার জন্য সেও পুনরায় জন্মেছিলো ইঁদুর হয়ে। পাহারা দিচ্ছিলো সেই সুবর্ণমুদ্রা। যখন অত্যধিক বৃষ্টিতে নদীতে বান এলো, তখন সাপ ও ইঁদুর দুজনেরই গর্তে জল ঢুকে পড়লো। তারা গর্ত থেকে বেরিয়ে সাঁতার কাটতে কাটতে হঠাৎ দেখতে পেয়ে গেলো সেই কাঠের গুঁড়ি। যার একদিকে সাপ আর অন্যদিকে ইঁদুর জায়গা নিল।

তারপর কাঠের গুঁড়িতে এসে আশ্রয় নিলো একটি শুকপাখি। শুকপাখিটা নদীর ধারে শিমুল গাছে থাকতো। বন্যার প্রবল বেগে গাছটা উপড়ে যেয়ে নদীতে পড়লো। উপায় না দেখে শুক উড়ে পালাতে চেষ্টা করেছিলো, কিন্তু বৃষ্টিতে বেশীদূর উড়তে না পেরে আশ্রয় নিলো সেই ভাসমান কাঠের গুঁড়ির উপরে। এমনি করে অপরিচিত চারটে প্রাণী একটুকরো কাঠের গুঁড়ি আশ্রয় করে ভেসে চললো। ক্রমে রাত হলো।

বোধিসত্ত্ব তখন ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মেছিলেন। তিনি নদীর তীরে নির্জন নিরালায় পাতার কুটিরে সন্ন্যাসধর্ম পালন করছিলেন। গভীর রাতে নদীর তীরে পায়চারি করার সময় তিনি রাজপুত্রের করুণ আর্তনাদ শুনতে পেলেন। তিনি ভাবলেন, জল থেকে তুলে বাঁচাবেন রাজকুমারকে। "ভয় নেই, ভয় নেই", বলে আশ্বাস দিয়ে তিনি নদীতে লাফিয়ে পড়লেন। তাঁর শরীরে ছিলো হাতির শক্তি। তিনি গাছের গুঁড়িটাকে নদীর তীরে টেনে আনলেন। রাজপুত্রকে উপরে তুলে নিলেন, কিন্তু সাপ, ইঁদুর ও শুকের দিকে চোখ পড়তেই তিনি তাদের আশ্রমে নিয়ে গেলেন। আশ্রমে আগুন জ্বেলে প্রথমে সাপ, ইঁদুর ও শুকের শরীর সেঁকলেন। ভাবলেন ইতর প্রাণীরা দুর্বল, অতএব এদেরই আগে সেবা করা উচিত। তারপর তিনি রাজপুত্রের শরীরে সেঁক দিলেন। চারজন অতিথির খাওয়ার জন্য ফলমূল দেওয়ার সময়ও তিনি প্রথমে সাপ, ইঁদুর ও শুককে খাওয়ালেন। রাজপুত্রকে খাওয়ালেন সবার শেষে। এইসব দেখে দুষ্টকুমারের মনে খুবই রাগ

হলো। দুষ্টকুমার মনে মনে ভাবলো, "আমি রাজপুত্র অথচ এই ভণ্ড তপস্বী আমার চেয়ে ইতর প্রাণীদের বেশী আদর যত্ন করছে।" এমনি করে দুষ্টরাজকুমার বোধিসত্বকে ঘৃণা করতে শুরু করলো। বোধিসত্বের সেবা শুশ্রূষায় কয়েকদিনের মধ্যেই সবাই সুস্থ হয়ে উঠলো। বন্যার জলও কমে গেল। বিদায় নেওয়ার সময় বোধিসত্বকে সাপ বললো, "বাবা আপনি আমার জীবন বাঁচিয়েছেন। আমি নির্ধন নই। অমুক জায়গাতে হিজল গাছের তলায় আমার চল্লিশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা আছে, যদি কখনও আপনার দরকার হয় তবে ঐ ধনরত্ন আমি আপনাকে দেব। আপনি শুধু সেখানে গিয়ে "দীঘা" বলে ডাকবেন, তাহলেই আমার দেখা পাবেন।" বিদায় নেওয়ার সময় ইঁদুরও বললো "আপনি আমার গর্তের কাছে গিয়ে 'ইঁদুর' বলে ডাকলেই আমি বেরিয়ে এসে সমস্ত সুবর্ণমুদ্রা আপনাকে দেব ঠাকুর।"

যাওয়ার সময় শুকও বললো "বাবা আমার তো সোনারূপা কিছু নেই, তবে যদি কখনও আপনার ভাল ধানের দরকার হয় তখন অমুক গাছের কাছে গিয়ে 'শুক' বলে ডাকলেই আমার দেখা পাবেন। আমি আমার সমস্ত জ্ঞাতিভাই বন্ধুদের দিয়ে আপনার জন্য কয়েক গাড়ি ভাল ধান জোগাড় করে দেবো।" এদিকে দুষ্টরাজকুমার মনে মনে ভেবেছিলো, ফাঁক পেলেই ব্যাটা সাধুকে মজা বুঝিয়ে দেব।" কিন্তু বিদায় নেওয়ার সময় মনের ভাব গোপন করে বললো "আমি রাজা হলে আপনি একবার আমার বাড়ীতে পায়ের ধুলো দেবেন। আমি প্রাণপণ সেবা করে নানারকম উপচারে আপনার পূজো করবো।" এর কিছুদিন পরেই সেই শয়তান রাজকুমার বারাণসীর সিংহাসনে বসলো।

বোধিসত্বের মনে খুবই ইচ্ছে হলো একবার সবার কাছে গিয়ে দেখেন সবাই তাকে কথা দেওয়া মত কাজ করে কিনা। তিনি প্রথমেই গেলেন সাপের ঠিকানায়। নির্দিষ্ট গর্তের কাছে গিয়ে ডাকলেন, বাবা, দীঘা বাড়িতে আছো? বোধিসত্বের ডাক শুনে সাপ একলাফে বেরিয়ে এলো। বোধিসত্বের পায়ে ফণা ছুঁইয়ে প্রণাম করে বললো, "বাবা,

এখানে চল্লিশ কোটি সুবর্ণমুদ্রা আছে আপনি সমস্ত তুলে নিয়ে যান।" বোধিসত্ব বললেন, "ঠিক আছে তাই হবে, যখন দরকার হবে, তখন নেবো।" বোধিসত্ব সেখান থেকে বিদায় নিয়ে গেলেন ইঁদুরের গর্তের কাছে। "ইঁদুর বলে ডাক দেওয়া মাত্রই গর্ত থেকে বেরিয়ে এসে সে তার ধনরত্ন বোধিসত্বকে দিয়ে দিতে চাইলো। দরকার হলে পরে নেবেন বলে বোধিসত্ব সেখান থেকে গেলেন শুকের বাসায়। "শুক" বলে হাঁকা মাত্রই গাছের মগডাল থেকে বেরিয়ে এল শুক। সসম্মানে শুক বোধিসত্বকে বললো, বাবা, অনুমতি করুণ, আপনার জন্য ধান সংগ্রহ করে আনি।" বোধিসত্ব শুককে জানালেন, প্রয়োজন হলে পরে নেবেন, তার কথা মনে থাকবে। এই বলে বিদায় নিলেন তিনি।

শুকের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে বোধিসত্ব এলেন বারাণসীতে। বোধিসত্ব তপস্বী বেশে নগরে প্রবেশ করলেন। তখন সেই মিত্রদ্রোহী রাজা নানা অলঙ্কার আর দুর্মূল্য পোষাক পরে হাতির পিঠে চেপে অনুচরবৃন্দের সঙ্গে নগর ঘুরতে বেরিয়েছিলো। দূর থেকে সে বোধিসত্বকে দেখেই চিনতে পারলো। পাপিষ্ঠ রাজা মনে মনে ভাবলো, "ব্যাটা, ভণ্ড তপস্বী আমার কাঁধে চেপে ভালমন্দ খাওয়ার তাল করতে আসছে। ও যে আমার উপকার করেছে এটা লোককে বলার আগেই ওর মুণ্ডুপাতের বন্দোবস্ত করতে হবে। সে অনুচরদের বললো, "ঐ যে ব্যাটা সন্ন্যাসী আসছে, ও যেন আমাকে জ্বালাতন করতে না পারে। ওকে এখনই হাতে পায়ে বেঁধে প্রত্যেক চৌমাথায় নিয়ে গিয়ে বেত মারার বন্দোবস্ত কর। পরে নগরের বাইরে বধ্যভূমিতে নিয়ে গিয়ে মাথাটা কেটে ধড়টা শূলে চড়িয়ে দাও।" ঘাতকেরা শয়তান রাজার আদেশে বোধিসত্বকে চৌরাস্তায় দাঁড় করিয়ে নিদারুণভাবে বেত মারতে লাগলো। বোধিসত্ব অমানুষিক যন্ত্রণায় কাতর হলেন। তবুও কোনও শব্দ করলেন না শুধু। বলতে লাগলেন, "মানুষ আর কাঠ বানের জলে ভেসে গেলে মানুষকে ছেড়ে

কাঠ তুলে নেয় লোকে। কারণ কাঠে কাজ হবে। মানুষ পরে তোমার শত্রু হবে।" প্রচণ্ড মার খাওয়ার সময় ক্রমাগত তিনি এই কথা বিড়বিড় করে বলে যেতে লাগলেন যন্ত্রনাকে তুচ্ছ করে।

রাস্তায় জমেছিলো প্রচুর লোক। তাঁদের মধ্যে বিজ্ঞলোকেরা বোধিসত্ত্বকে বললেন "আপনার এ দুর্দশার কারণ কি? আপনি কি কখনও রাজার উপকার করেছিলেন?" বোধিসত্ত্ব তখন রাজাকে উদ্ধার করার সমস্ত ঘটনা লোকেদের খুলে বললেন।

বেধিসত্ত্বের মুখ থেকে আসল কথা জানতে পেরে নগরবাসীরা খেপে গেলো। তপস্বী বোধিসত্ত্বকে যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য তারা রাগে খেপে গেলো। তপস্বী বোধিসত্ত্বকে যন্ত্রণা দেওয়ার জন্য তারা রাগে অন্ধ হয়ে রাজাকে ঘিরে ফেললো! বিভিন্ন অস্ত্রের আঘাতে কুপিয়ে কুপিয়ে খুন করলো রাজাকে। রাজার মৃতদেহ পা ধরে টেনে রাস্তার পাশে নর্দমায় ফেলে দিলো। এবং বোধিসত্ত্বকে সিংহাসনে বসিয়ে রাজা করলো।

বোধিসত্ত্ব সিংহাসনে বাসার পর, সাপ, ইঁদুর এবং শুকের কাছে গেলেন। তারা প্রত্যেকেই প্রতিজ্ঞামত ধনসম্পত্তি এবং কয়েক গাড়ি ধান এনে দিলো। এমনিভাবে সত্তর কোটি স্বর্ণ মুদ্রা, কয়েক গাড়ি ধান, সাপ, ইঁদুর এবং শুককে সঙ্গে নিয়ে বোধিসত্ত্ব বারানসীতে ফিরে এলেন। সাপ, ইঁদুরের জন্য সুন্দর বাসা, শুকের জন্য সোনার খাঁচা বানিয়ে দিলেন। নিজের হাতে প্রতিদিন সাপ, ইঁদুর ও শুকের দেখাশোনা করতে লাগলেন। এমনি ভাবে সাপ, ইঁদুর ও শুকের সঙ্গে বন্ধুর মত বাস করতে লাগলেন বোধিসত্ত্ব।

১০ [] ভীমসেন-জাতক []

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের রাজত্বকালে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মেছিলেন। বড় হয়ে তিনি তক্ষশিলার সুবিখ্যাত আচার্য্যের কাছে শিক্ষালাভ করেন। তিনি বেদ এবং আঠারো রকমের বিদ্যাতে সুপণ্ডিত হলেন। লোকে তাঁকে "চুল্ল ধনগ্রহ" পণ্ডিত এই নাম দিলো।

বোধিসত্ত্ব তক্ষশিলা ছেড়ে কাজের খোঁজে গেলেন অন্ধ্ররাজ্যে। এদিকে বোধিসত্ত্ব ছিলেন ঈষৎ কুব্জ ও খর্বাকার। পাছে রাজা তাকে দেখে হাসেন কিংবা ভাবেন তাঁর মত কুঁজো বামুনের দ্বারা কোনও কাজ চলবেনা তাই বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, কোনও লম্বা চওড়া লোক খুঁজে নিয়ে তাকে মুখপাত্র করবেন। তেমন কোন লম্বা চওড়া লোকের ছায়ায় তাঁর জীবিকা নির্বাহের কথা ভাবলেন।

লোক খুঁজতে খুঁজতে বোধিসত্ত্ব গেলেন হাটের কাছে তাঁতিদের পাড়ায়। লম্বা চওড়া একজন লোককে দেখে পছন্দ হলো। লোকটি তাঁতির কাজ করতো। নাম ভীমসেন। বোধিসত্ত্ব ভীমসেনকে বললেন, "তোমার এই বিরাট লম্বা চওড়া চেহারা নিয়ে তাঁতির কাজ করে মরছো কেন? আর তোমায় এ কাজ করতে হবে না। সমস্ত জম্বু দ্বীপে আমার চেয়ে ভাল তীর ধনুকের যুদ্ধ বিশারদ আর কেউ নেই। কিন্তু আমার এই কোল কুঁজো চেহারা দেখে রাজার সেটা বিশ্বাস হবে না। ভাববেন আমি কাজের লোক নই। তুমি আমার সঙ্গে চল। রাজার কাছে গিয়ে বুক ফুলিয়ে দাঁড়াবে। বলবে, তোমার চেয়ে বড় ধনুর্দ্ধর আর কেউ নেই। রাজা খুশী হয়ে তোমাকে সৈনিকের কাজ দেবেন। তাহলে তোমার বেতন থেকে আমার ও

খাওয়াপরা চলবে। তোমার কোনও ভয় নেই, তোমার পেছনে থেকে তোমার সমস্ত কাজ আমিই করে দেবো।" ভীমসেন এ প্রস্তাবে রাজি হলো।

বোধিসত্ত্ব ভীমসেনকে সঙ্গে নিয়ে বারানসীর রাজার কাছে উপস্থিত হলেন। সেখানে বোধিসত্ত্বের পরিচয় হলো ভীমসেনের বালক ভৃত্য-রূপে। রাজাকে প্রণাম করার পর ভীমসেন জানালো, মহারাজ, আমি ধনুর্দ্ধরের চাকরী চাই। রাজা প্রতি পনের দিন অন্তর এক হাজার মুদ্রার বিনিময়ে তাকে চাকরী দিলেন।

ভীমসেন রাজকর্মচারী হলো। বোধিসত্ত্ব সঙ্গে রইলেন বালক ভৃত্য হিসেবে; যদিও পিছন থেকে তিনি-ই ভীমসেনের সমস্ত কাজ করে দিতে লাগলেন। এদিকে কাশী রাজ্যের জঙ্গলে এক মানুষ খেকো বাঘের উপদ্রব হলো। রাজা ভীমসেনকে ভার দিলেন বাঘ মারার জন্য। ভীমসেন তর্জন গর্জন করে আস্ফালন করলো, এ বাঘকে মারা তো তার কাছে ছেলে খেলা। রাজা তাকে লোকলস্কর দিয়ে বাঘ মারতে পাঠালেন। বোধিসত্ত্ব সঙ্গে গেলেন না। তবে ভীমসেনকে বুদ্ধি বাতলে দিলেন। "ভীমসেন, তুমি একা বাঘের সন্ধানে জঙ্গলে ঢুকো না। দু'হাজার তীরন্দাজবাহিনী সংগে নিয়ে ঢুকবে। যে মূহূর্তে বুঝবে বাঘটা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে তক্ষুনি পালিয়ে ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়বে। উপুড় হয়ে শুয়ে থাকবে। তীরন্দাজরা যখন তীরের আঘাতে বাঘটাকে মেরে ফেলবে এবং যখন বুঝবে বাঘটা পুরোপুরি মৃত তখন হাতে একটা লতা নিয়ে বাঘের কাছে যাবে আর বাঘের মাথাতে পা রেখে গর্জন করে উঠবে—"কাপুরুষের মত তীর মেরে বাঘকে মারলো কে? আমি বুঝি ভাবলাম লতা দিয়ে বেঁধে টানতে টানতে বাঘটাকে গরুর মত রাজার কাছে নিয়ে যাবো। তা নয়, আগেই বাঘটাকে মেরে ফেললো। কার এমন সাহস হলো?" তীরন্দাজরা যখন ভীত হয়ে তোমাকে বলবে, একথা রাজার কাছে না জানাতে এবং প্রচুর-ধন তোমাকে দেবে তারা, মুখ বন্ধ রাখতে চেয়ে। রাজা

জানবেন তুমিই বাঘ মেরেছো, অনেক অনেক ধন মিলবে রাজার কাছে থেকে।

ভীমসেন বোধিসত্ত্বের কথামত সব কাজ করলো। বাঘ মারার জন্য বীরত্বের পুরস্কার হিসেবে প্রচুর ধনসম্পদ পেলো রাজার কাছ থেকে।

এর কিছুদিন পরে খবর এলো, এক বুনো মোষ রাজপথের উপর বড়ই উপদ্রব করছে। রাজা ভীমসেনকে পাঠালেন বুনো মোষ মেরে আনতে। পূর্বের মতই ঠিক একই কৌশলে বোধিসত্ত্বের পরামর্শমত মোষকে মেরে প্রচুর ধনসম্পদ পেলো ভীমসের।

এদিকে প্রচুর ধনসম্পদ লাভ করে অহঙ্কারে ধরাকে সরা জ্ঞান করতে লাগলো ভীমসেন। কথায় কথায় সে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করতে লাগলো বোধিসত্ত্বকে। এখন আর বোধিসত্ত্বের কাছ থেকে কোনও রকম পরামর্শ নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করলো না সে। "কুঁজো বামুন, তুমি কি ভেবেছো, তোমাকে না হলে আমার দিন চলবে না? তোমাকে ছাড়া আর লোক নেই?" এমনি করে কথায় কথায় বোধিসত্ত্বকে অপমান করতে লাগলো দাম্ভিক ভীমসেন। ভুলে গেলো। একদিন সে গরীব তাঁতি ছিলো। ভালো করে খেতে পেতোনা।

এদিকে শত্রু রাজা বারাণসী অবরোধ করলো। ব্রহ্মদত্ত কোন উপায় না দেখে ভীমসেনকে ডেকে পাঠালেন রাজার সঙ্গে যুদ্ধ করতে। ভীমসেন আপাদমস্তক সৈনিকের মত পোষাক পরে হাতির পিঠে চেপে যুদ্ধক্ষেত্রে রওনা হলো। ভীমসেন যাতে মারা না যায় সেজন্য বোধিসত্ত্ব ভীমসেনের পেছনে বসলেন। প্রচুর সৈন্য নিয়ে হাতি যখন নগর দ্বার দিয়ে বেরিয়ে শত্রু সৈন্যের সামনে এসে দাঁড়ালো, তখন যুদ্ধ-ক্ষেত্রের রণবাদ্য শুনে হাতির পিঠে কাঁপতে লাগলো ভীমসেন। বেধিসত্ত্ব ভীমসেনকে দড়ি দিয়ে হাতির পিঠে বেঁধে রাখলেন, পাছে পড়ে গিয়ে মারা না যায়। কিন্তু ভীমসেন যুদ্ধ ক্ষেত্রে লড়াই দেখেই এমন ভয় পেল যে হাতির পিঠেই জামাকাপড়ে মলত্যাগ করে ফেললো। অত সুন্দর হাওদা থেকে দুর্গন্ধ ছড়াতে লাগলো। বোধিসত্ত্ব ভীমসেনকে

বললেন, "তোমার বীরত্ব কোথায় গেলো ? আগেতো অনেক বড় বড় কথা বলেছিলে। এখন কিনা হাতির পিঠ নোংরা করে ছাড়লে ? ভয় নেই তোমার। বাড়ি যাও। ভাল করে চান করে পরিষ্কার হও।" এই বলে তিনি ভীমসেনকে হাতির পিঠ থেকে নীচে নামিয়ে দিলেন।

বোধিসত্ব তখন একাই হাতির পিঠে চেপে তীর ধনুক দিয়ে যুদ্ধ করতে লাগলেন সিংহ বিক্রমে। শত্রুসৈন্য ভেদ করে তিনি আক্রমণকারী রাজাকে বন্দী করে হাতে পায়ে শেকল বেঁধে বারাণসী-রাজ ব্রহ্মদত্তের কাছে হাজির করলেন। রাজা ব্রহ্মদত্ত খর্বকায় পিঠে কুঁজ—এই ব্রাহ্মণের বীরত্বে মুগ্ধ হলেন। তিনি বোধিসত্বকে প্রচুর ধন সম্পদ দান করলেন। সেই থেকে সমস্ত জম্বু দ্বীপে বোধিসত্বের বীরত্ব কাহিনী ছড়িয়ে পড়লো।

বোধিসত্ব অকৃতজ্ঞ ভণ্ড ভীমসেনকে করুণা করে প্রচুর অর্থ দিয়ে বিদায় করলেন। ভীম সেন পুনরায় তাঁতিদের কাছে ফিরে গেলো। কখন ও বেশী দর্প করতে নেই, তাহলেই দ্রুত পতন হবে।

১১ [] কুহক-জাতক []

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে এক গ্রামে এক ধূর্ত্ত তপস্বী বাস করতো। মাথায় জটা নিয়ে সেই তপস্বী ভান করতো সে পরম শীলবান। ঐ গ্রামেরই একজন ধনী লোক সন্ন্যাসীর বাসের জন্য বনের মধ্যে একটি পাতার কুটির বানিয়ে দিয়েছিলেন। এমনকি সন্ন্যাসীর জন্য উৎকৃষ্ট খাবার দাবার ও নিজের বাড়ি থেকে পাঠাতেন। সেই ধনী ব্যক্তিটির খুবই শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছিল সন্ন্যাসী।

একদিন একশো স্বুবর্ণমুদ্রা ডাকাতের ভয়ে সন্ন্যাসীর কুটিরে মাটির

নীচে পুঁতে রাখলো সেই ধনী ব্যক্তিটি। লোকটি সন্ন্যাসীকে বললো, "প্রভু দয়া করে এদিকে একটু খেয়াল রাখবেন।"

"আমরা হলাম গিয়ে সন্ন্যাসী। আমাদের একথা বলা অর্থহীন। পরের দ্রব্যে আমাদের কখনও লোভ জন্মে না। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো।"

সেই লোকটি সন্ন্যাসীকে শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বাড়ী চলে গেলো। সেদিনই ধূর্ত তপস্বী মনে মনে ফন্দী আঁটলো সমস্ত স্বুবর্ণমুদ্রা নিয়ে সে এখান থেকে পালিয়ে যাবে। পরদিন মেঝে থেকে টাকাটা তুলে নিয়ে সে আর এক জায়গায় পুঁতে রাখলো। দুপুরে ধনী লোকটির বাড়ীতে খেতে গিয়ে বললো, "বৎস অনেকদিন হয়ে গেলো এখানে আছি। আমাদের বেশীদিন লোকালয়ে থাকতে নেই, এতে করে সন্ন্যাসধর্মের ক্ষতি হয়, আর দীর্ঘদিন ধরে তোমার অন্ন ও ধ্বংস করছি। আর নয়। আমি এবার গভীর অরণ্যে যেয়ে সাধনা করবো ঠিক করেছি।" সেই ধনী ব্যক্তির বার বার অনুরোধেও জাল সন্ন্যাসী মতের পরিবর্তন করলো না। বাধ্য হয়ে সে সন্ন্যাসীকে গ্রামের সীমানা পর্য্যন্ত এগিয়ে দিয়ে এলো। পা ছুঁয়ে ভক্তিতে শেষ প্রনাম জানালো।

কিছুদূর গিয়েই ভণ্ড তপস্বী ফিরে এলো। জটার ভিতর থেকে একগাছি ঘাস বের করে সেই লোকটির হাতে দিলো। বললো "বৎস তোমার চালের একগাছা খড় আমার জটায় লেগে আছে। সন্ন্যাসীদের পক্ষে অদত্তা দান নিষিদ্ধ। সেইজন্যই তোমাকে খড়টি ফেরত দিতে এলাম।" খড়টা ফেরত দিয়ে সন্ন্যাসী চলে গেলে লোকটি ভাবলো, সন্ন্যাসী কত মহৎ। কত সূক্ষ্ম তার ধর্মজ্ঞান। পরের দ্রব্য এককুটো খড় পর্যন্ত তিনি স্পর্শ করেন না। সন্ন্যাসীর চরিত্রে দারুণ ভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়লো লোকটি।

এই ঘটনার সময় বোধিসত্ত্ব সেই গ্রামে জিনিসপত্র ফেরি করতে এসেছিলেন। তপস্বীর কথা শুনে তাঁর সন্দেহ হলো। বোধিসত্ত্ব জেনে নিলেন যে ধনী লোকটি তপস্বীর কুটিরের মেঝেতে একশ স্বর্ণ-

মুদ্রা পুঁতে রেখেছিলো। খোঁজ নিয়ে দেখা গেলো স্বুবর্ণমুদ্রাগুলো উধাও হয়ে গেছে। বোধিসত্ত্ব জানালেন, "ভণ্ড তপস্বীর কাজই এটা। আর কেউ নেয় নি। তাড়াতাড়ি করে অনুসরণ করলে ভণ্ড সন্ন্যাসীর দেখা মিলতে পারে।" খুব জোরে দৌড়ে গিয়ে সবাই মিলে সন্ন্যাসীকে ধরে ফেললো। মারধর দেওয়ার পর ভণ্ড তপস্বী স্বীকার করলো, স্বুবর্ণমুদ্রা সেই নিয়েছে। স্বর্ণমুদ্রাগুলি ফেরত দেওয়ার পর তিনি সেই ভণ্ডতপস্বীকে সাবধান করে বললেন, "আর কখনও এমন চালাকি কোরো না।" প্রাণে না মেরে বোধিসত্ত্বের কথায় সন্ন্যাসীকে ছেড়ে দেওয়া হলো। কখন ও বেশী লোভ করতে নেই, তাতে পতন হবেই।

১২ [] শূকর-জাতক []

বারাণসীতে তখন রাজা ছিলেন ব্রহ্মদত্ত। সেবারে বোধিসত্ত্ব সিংহ হয়ে জন্মেছিলেন। হিমালয় পর্বতে এক গুহাতে বোধিসত্ত্ব থাকতেন। কাছেই ছিলো কাকচক্ষু জলের এক মনোরম সরোবর। সরোবরের ধারেই থাকতো এক পাল শূয়র। সরোবরের অপর দিকে কয়েকজন তপস্বী পর্ণকুটিরে বাস করতেন।

একদিন দুপুরবেলা। এক সিংহ সেদিন তার দুপুরের খাওয়া সেরে নিলো। শিকার করা বড়সড় এক মোষের মাংসে। খাওয়াটা সেদিন একটু বেশীই হয়ে পড়লো। জল খেয়ে সরোবর থেকে চলে যাবার সময় সিংহের নজরে পড়লো হৃষ্টপুষ্ট এক শূয়র। শূয়রটি সরোবরের তীরে চরে বেড়াচ্ছিলো। সিংহ মনে মনে ভাবলো, শূয়রটাকে অন্য একদিন আয়েশ করে খেতে হবে। সিংহ নিজেকে আড়ালে রাখলো যাতে তাকে দেখে শূয়রটি ভয় না পায়। কিন্তু শূয়রটি দেখতে পেয়ে গেল সিংহকে। সে ভাবলো, সিংহ তাকে দেখে

ভয় পেয়ে লুকিয়েছিলো, এখন পালিয়ে যাবার মতলব করছে। বুক ফুলিয়ে দর্পিত শূয়র সিংহের সামনে এসে দাঁড়ালো। "কোথায় পালিয়ে যাচ্ছিস তুই ব্যাটা—সাহস থাকেতো আমার সংগে লড়ে যা—" শূয়র সিংহের পথ আটকে যুদ্ধে আহ্বান করলে, সিংহ সবিনয়ে জানালো, "ভাই শূয়র, আজ নয়। আজ থেকে সাত দিন পরে এখানে এসে আমি তোমার সংগে যুদ্ধ করবো।" একথা বলেই সিংহ চলে গেলো।

শূয়রটি তার পাড়াতে সবাইকে ডাঁক করে বলে বেড়াতে লাগলো যে, সে সিংহের সংগে যুদ্ধ করার ক্ষমতা রাখে। এদিকে অন্যান্য শূয়রেরা কিন্তু এ খবরে ভয়ে ভাবনায় আধমরা হয়ে গেলো। তারা সবাই মিলে গর্বিত শূয়রকে বোঝাতে লাগলো, সে যেন ভুলেও সিংহের সংগে লড়ার চেষ্টা না করে। তা হলে শূয়রপাড়াতে ছানাপোনাসুদ্ধ কেউই আর প্রাণে বাঁচবে না। তখন সেই নির্বোধ শূয়রও ভয় পেয়ে গেলো। সবাই মিলে তখন তাকে পরামর্শ দিলো, সে যেন তপস্বীদের মলত্যাগ ভূমিতে যেয়ে সাতদিন গড়াগড়ি দেয় আর সূর্যের উত্তাপে বেশ ঝরঝরে করে সারা শরীর শুকিয়ে নেয়। এরপর যুদ্ধের দিন ভোরেই শিশিরজলে সারা শরীর ভিজিয়ে নেবে। দেখে নেবে বাতাস কোন দিক থেকে বইছে। আর এমনভাবে যুদ্ধের সময় সিংহের সামনে গিয়ে দাঁড়াবে, যাতে করে বাতাস প্রথমে শূয়োরের গায়ে লেগে পরে যেন সিংহের দিকে যায়। তা হলেই কেল্লা ফতে হবে। কারণ সিংহ অতি শুচিপ্রিয়। সে শূয়রের শরীরের মল-গন্ধ অনুভব করেই স্বেচ্ছায় পরাজয় স্বীকার করে নেবে। আর যুদ্ধ করতে চাইবে না কিছুতেই।

যথারীতি সরোবরের তীরে যুদ্ধের দিন শূয়র আর সিংহ লড়াইয়ের জন্য মুখোমুখি হলো। এদিকে সিংহ শূয়রের শরীরের নোংরা পূতিমল গন্ধ টের পেয়ে বললো, "ভাই শূয়র, বেড়ে চাল চেলেছো ভাই। তোমার গায়ের নোংরা দুর্গন্ধ না থাকলে এ মুহূর্তেই আমি তোমার ঘাড় মটকে রক্ত খেতাম। কিন্তু তোমার নোংরা শরীরে দাঁত

বসানোতো দূরের কথা—হাত-পায়ের থাবা বসাতেও বমি পাচ্ছে আমার। তোমার শরীরের ময়লা গন্ধের জন্যই তুমি জিতে গেলে।"

স্বেচ্ছায় পরাজয় মেনে নিয়ে অতি দ্রুত শূয়রের কাছ থেকে চলে গেলো সিংহ। কিন্তু মূর্খ দর্পিত শূয়র আস্ফালন করে সবাইকে বলতে লাগলো, "হেরো—হেরো—সিংহ হেরে পালিয়ে গেলো।"

কিন্তু অন্যান্য শূয়রেরা মূর্খ শূয়রের আচরণে খুবই ভীত হলো। পাছে সিংহ পুনরায় সেখানে এসে তাদের মেরে ফেলে এই ভয়ে তারা সবাই গভীর জঙ্গলে পালিয়ে গেলো চিরদিনের মত। শক্তিহীন লোকরাই অযথা শক্তির দর্প করে নিজের পতন ডেকে আনে।

১৩ [] কূটবনিক-জাতক []

পুরাকালে ব্রহ্মদত্ত ছিলেন বারাণসীর রাজা। বোধিসত্ত্ব তখন অমাত্যকুলে জন্মেছিলেন। বড় হয়ে তিনি বিচারকের পদে আসীন হলেন।

সে সময়ে দু'জন বণিকের মধ্যে খুবই বন্ধুত্ব ছিলো। এদের মধ্যে একজন নগরে থাকতো। অন্যজন গ্রামে বাস করতো।

একবার গ্রামবাসী বণিক নগরের বণিকের কাছে পাঁচশো লাঙ্গল-ফাল গচ্ছিত রেখেছিলো। এদিকে নগরবাসী বণিক লোভ সামলাতে না পেরে সমস্ত লাঙ্গল-ফাল বেচে দিলো। সমস্ত অর্থ নিজেই মেরে দিলো। আর যেখানে লাঙ্গল-ফাল রাখা ছিলো সেখানে ইঁদুরের বিষ্ঠা ছড়িয়ে রাখলো।

বেশ কিছুদিন পর গ্রামবাসী বণিক তার নগরবাসী বণিকের বাড়িতে এলো। গ্রামবাসী বণিক তার লাঙ্গলের ফালগুলো ফেরত চাইলো। কপট শোকের ভান করে নগরবাসী বণিক বললো, "বন্ধু

আমি যে তোমার কি ক্ষতি করে ফেল্লাম—এতো যত্ন করে লাঙ্গলের ফালগুলোকে রাখলাম—তবুও ইঁদুরের হাত থেকে বাঁচাতে পারলাম না। সব খেয়ে নিয়েছে—চলো, নিজের চোখে সব দেখবে—” এ কথা বলে নগরবাসী বণিক তার বন্ধুকে লাঙ্গলের ফাল যেখানে রাখা ছিলো সেই ঘরে নিয়ে গিয়ে ইঁদুরের নাদি দেখালো।

গ্রামবাসী বণিক নিজে থেকেই বললো, “বেশ, খেয়েছে তো বেশ করেছে। ইঁদুরে খেয়ে ফেললে আর কি করা যাবে।”

গ্রামবাসী বণিক স্নান করতে যাবার সময় ধূর্ত্ত বণিকের একমাত্র ছেলেকে সংগে নিলো। ফেরার পথে চেনাজানা এক বন্ধুর বাড়িতে ছেলেটিকে আটকে রেখে এলো। নগরবাসী বণিক যখন তার ছেলের কথা জানতে চাইলো তখন গ্রামবাসী বণিক জানালো, “কি বলবো বন্ধু, দুঃখে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে। স্নান করছি দুজনে মিলে—এমন সময় একটা বাজপাখি তীরের মত ছোঁ মেরে তোমার ছেলেকে নখে করে নিয়ে আকাশে উড়ে গেলো। আমি চীৎকার চেঁচামেচি করলাম। কিন্তু অনেক চেষ্টা করেও তোমার ছেলেকে উদ্ধার করে আনতে পারিনি।” একথা শুনে রেগে আগুন হয়ে গেলো নগরবাসী বণিক—“তুমি মিথ্যেকথা বলছো—বাজ পাখিতে কি কখনও একটা ছেলেকে তুলে নিয়ে যেতে পারে? সত্যি করে বলো, ছেলেকে কি করেছো?”

“কি জানি ভাই, কিন্তু অসম্ভব যদি ঘটেই থাকে তাহলে আমার কি করার আছে বলো? তবে এটা ঠিক—তোমার ছেলেকে বাজপাখিতেই তুলে নিয়ে গেছে—” গ্রাম্য বণিকের কথা শেষ হলে ধূর্ত বণিক ‘শয়তান’, ‘চোর’, ‘খুনী’, এসব বলে ক্রমাগত গ্রাম্যবণিককে গালিগালাজ দিতে লাগলো। কোন উপায় না দেখে ধূর্ত বণিক বিচারকের কাছে গেলো গ্রাম্যবণিকের নামে নালিশ করতে। গ্রাম্য বণিক ও ইচ্ছা করেই সংগে গেলো তার। ধূর্ত বণিক বোধিসত্ত্বকে বললো, “ধর্মাবতার এই লোকটা আমার ছেলেকে সঙ্গে করে চান করতে গিয়েছিলো। কিন্তু আমার ছেলেকে সংগে নিয়ে

ফেরেনি। বলছে, আমার ছেলেকে নাকি বাজপাখিতে তুলে নিয়ে গেছে। আপনি অনুগ্রহ করে সুবিচার করুণ ধর্মাবতার!" বোধিসত্ত্ব গ্রামবাসী বণিককে জিজ্ঞেস করলেন, "কি হে' আসল ব্যাপারটা কি?" গ্রামবাসী বণিক বললো, "হ্যাঁ ধর্মাবতার কথাটা সত্যি। আমি এ লোকের ছেলেকে সংগে করে নিয়ে গেছিলাম। কিন্তু স্নানের ঘাটে বাজপাখিতে ছোঁ মেরে নিয়ে গেছে।" বাজপাখিতে ছোঁ মেরে ছেলে নিয়ে যেতে পারে? একথাতো কখনও কোথায়ও শুনিনি।" বোধিসত্ত্বের কথা শুনে গ্রামবাসী জানালো "ধর্মাবতার আপনার কাছে আমারও একটা কথা জানবার আছে। বাজপাখিতে যদি একটা ছেলে নিয়ে আকাশে উড়তে না পারে, তবে ইঁদুরেই কি লোহার ফাল খেয়ে ফেলতে পারে?"

একথা শুনে বোধিসত্ত্ব প্রশ্ন করলেন, "একথা কেন বলছো?" "ধর্মাবতার তাহলে সব খুলেই বলছি আপনাকে। আমি এ লোকের বাড়িতে পাঁচশো লাঙ্গলের ফাল গচ্ছিত রেখেছিলাম। এখন এ লোক বলছে সেগুলো নাকি ইঁদুরে খেয়ে গেছে। আর আমাকে ইঁদুরের নাদিগুলো পর্য্যন্ত দেখিয়েছে। তবেই দেখুন ধর্মবতার, ইঁদুরে যদি লাঙ্গলের ফাল খেতে পারে, তবে বাজপাখিতেই বা ছেলে নিয়ে যেতে পারবেনা কেন? এ লোক বলছে ইঁদুর লোহার ফাল খেয়ে ফেলেছে —এখানে খেয়েছে কি না খেয়েছে এর বিচার আপনিই করুন ধর্মাবতার!" বোধিসত্ত্ব গ্রাম্যবণিকের কথা শুনে বুঝলেন, এ লোক ধূর্তের সংগে ধূর্তের মতই ব্যবহার করে প্রকৃত উপায় খুঁজে বের করেছে।

বোধিসত্ত্বের কঠোর প্রশ্নের সামনে ধূর্ত নগর বণিক তার সব দোষ স্বীকার করলো। গ্রাম্য বণিককে সমস্ত লাঙ্গলের ফলা কিনে দিতে বাধ্য হলো এবং ফলার বিনিময়ে নিজের ছেলেকেও ফিরে পেলো চালাকের সঙ্গে চালাকী করেই চলতে হয়।

১৪ [] গুণ-জাতক []

পুরাকালে বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্তর সময় বোধিসত্ত্ব সিংহ হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি পর্বত গুহায় থাকতেন। পর্বতের পাদদেশে ছিলো এক বৃহৎ সরোবর। সরোবরের কর্দামাক্ত তীরে জন্মাতো কচি কচি সবুজ ঘাস। হরিণ, খরগোস ও অন্যান্য তৃণভোজী পশুদের স্বর্গ ছিলো সেই বিচরণভূমি।

একদিন ভোরবেলার ঘটনা। সবুজ তৃণভূমিতে মনের সুখে চরছিলো এক হরিণ। সিংহরূপী বোধিসত্ত্ব হরিণকে ধরার জন্য সিংহবেগে নীচের দিকে ধেয়ে গেলেন। হরিণটা মরণ ভয়ে কাতর অর্তনাদ করতে করতে পালালো। বোধিসত্ত্ব বেগ সামলাতে না পেরে কাদায় পড়ে গেলেন। তাঁর বিশাল দেহ কাদায় অনেকখানি ডুবে গেলো। তিনি কিছুতেই কাদা থেকে নড়তে পারলেন না। এক সপ্তাহ কাদায় দাঁড়িয়ে থেকে অনাহারে কেটে গেলো তাঁর।

এদিকে এক শৃগাল খাবারের খোঁজে বেরিয়ে বোধিসত্ত্বকে সেই অবস্থায় দেখতে পেয়ে দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছিলো। বোধিসত্ত্ব প্রাণপণ চীৎকার করে শৃগালকে বল্লেন, "ওহে শৃগাল, আমার কথা শোন— পালিয়ে যেও না আমি এখানে কাদায় আটকে রয়েছে। তুমি আমার প্রাণ বাঁচানোর উপায় বাৎলাও।" একথা শুনে শৃগাল সিংহের কাছে এলো। "আমি আপনাকে উদ্ধার করতে পারি বটে, তবে ভয় হয় উদ্ধার পেলেই যদি আপনি আমাকে খেয়ে ফেলেন।" আমি বলছি, তোমার কোন ভয় নেই। তোমাকে আমি খাবো না তোমাকে খাওয়াতো দূরের কথা।

আমি বরং তোমার উপকার করবো। যেভাবেই হোক আমার প্রাণ বাঁচাও।"

সিংহের কথা শুনে শৃগাল কঠিন পরিশ্রমে সিংহের চার পায়ের পাশ থেকে কাদা আর জল সরালো। সিংহের পেটের নীচে মাথা দিয়ে ঠেলে ঠেলে অতিকষ্টে সিংহকে অনেকটা সুবিধাজনক অবস্থা করে দিলো। সিংহ তখন যথাসাধ্য চেষ্টাতে কাদা থেকে লাফ দিয়ে শুকনো মাটিতে গিয়ে পড়লেন। বেশ কিছুক্ষণ সেখানে বিশ্রাম নিয়ে অবসন্নতা কাটিয়ে সিংহ সরোবরের জলে গা ধুয়ে নিলেন। পরে এক মহিষ বধ করলেন। সিংহ তাঁর তীক্ষ্ণ দন্ত দিয়ে ছিঁড়ে বেশ খানিকটা মাংস শৃগালকে খেতে দিলেন। "বন্ধু শৃগাল, তুমি খেয়ে নাও আগে।" যতক্ষণ শৃগালের খাওয়া শেষ না হলো, ততক্ষণ নিজে খেলেন না সিংহ। খাওয়াদাওয়া শেষ হলে পরে শৃগাল তার বউয়ের জন্য একখণ্ড মাংস তুলে নিলো। দেখাদেখি সিংহও তাঁর সিংহীর জন্যে বেশ খানিকটা মাংস নিয়ে নিলেন। সিংহ নিজে গিয়ে শৃগালীকে মাংস দিয়ে এলেন। শৃগাল ও শৃগালী উভয়কেই আশ্বস্ত করে বললেন, "আজ থেকে তোমরা আমার বন্ধু হলে। তোমাদের রক্ষণা-বেক্ষণের সব দায়িত্ব আমার।" এছাড়া সিংহ তাঁর নিজের গুহার সংলগ্ন একটি গুহাতে শৃগাল ও শৃগালীকে থাকতে দিলেন।

সেদিন থেকেই সিংহ শিকার করতে যাবার সময় শৃগালকেও সংগে নিতেন। সিংহী ও শৃগালী গুহায় থাকতো। তাঁরা নানা হরিণ শিকার করতেন। নিজেদের আহার সেরে নিজ নিজ স্ত্রীর জন্য মাংস নিয়ে ফিরতেন।

এভাবে বেশ কিছুকাল কেটে গেলো। সিংহের একটি পুত্র হলো। শৃগালেরও একটি ছেলে হলো। সবাই মিলে সুখেই কেটে যাচ্ছিলো দিন। সিংহশাবক আর শৃগালশাবক একই সংগে বন্ধুর মতো বড় হতে লাগলো। কিন্তু সিংহীর হঠাৎই মনে বিষ ঢুকলো। সিংহ ও

শৃগালের এতো বেশী বন্ধুত্বকে সে ভালো চোখে দেখলো না। সে মনে মনে ঠিক করলো যেভাবেই হোক ভয় দেখিয়ে শৃগালদের তাড়াতে হবে এখান থেকে।

একদিন যখন সিংহ শৃগালকে নিয়ে মৃগয়ায় বেরিয়েছেন, তখন সিংহী শৃগালীকে ভয় দেখাতে লাগলো, "এই বেহায়ারা, তোরা এখানে রয়েছিস কেন? যা এক্ষুনি পালিয়ে যা এখান থেকে। না হলে ঘাড় মটকে রক্ত খাবো তোদের।" এমনিভাবে শৃগালী ও তার শাবকের ওপর উৎপীড়ন চালাতে লাগলো সিংহী।

ভীতা শৃগালী শৃগালকে সব কথা খুলে বললো। শৃগাল ভাবলো, "হয়তো সিংহের পরামর্শেই সিংহী এমন দুর্ব্যবহার করছে। আমরা অনেকদিন এখানে থাকাতে ওঁদের হয়তো অসুবিধে হচ্ছে। এখন বোধ হয় আমাদের প্রাণবধ করার মতবল আঁটছে। তার চেয়ে আগের বাসস্থানে ফিরে যাওয়াটাই ঠিক হবে।"

শৃগাল তাই সিংহকে জানালো, "প্রভু! আমরা দীর্ঘদিন ধরে আপনার আশ্রয়ে রয়েছি। এখন হয়তো আপনার গলগ্রহ হয়ে পড়েছি। আজ আমরা যখন মৃগয়ায় গেলাম, তখন সিংহী শৃগালীকে ভয় দেখিয়েছে যে এখান থেকে চলে না গেলে আমাদের প্রাণে মেরে ফেলবে নাকি! উৎপীড়ন না করে আমাদের চলে যেতে বল্লেইতো আমরা চলে যেতাম প্রভু!"

শৃগালের কথা শুনে বোধিসত্ত্ব সিংহীকে ডেকে বললেন, "দেখো, তোমার মনে পড়ে অনেকদিন আগে শিকার করতে গিয়ে আমি সাত দিনের দিন বাড়ি ফিরেছিলাম। সংগে করে নিয়ে এসেছিলাম শৃগাল ও শৃগালীকে। আমি কেন সাতদিন বাড়ি ফিরতে পারিনি জানো— এক হরিণ শিকার করতে গিয়ে আমি কাদার পাঁকে আটকে গিয়েছিলাম। এক সপ্তাহ অনাহারে কেটেছিলো। পরে এই শৃগালের অনুগ্রহেই প্রাণরক্ষা হয় আমার। এই বন্ধু শৃগালই আমার প্রাণদাতা। দুর্বল হোক বা সবল হোক, যে মিত্রধর্ম পালন করে সেই

প্রকৃত মিত্র। সাবধান, আজ থেকে আমার সখা, সখী তাদের ছেলেকে কোনরকম অপমান করবেনা।"

সিহের কথা শুনে সিংহী শৃগালীর নিকট ক্ষমা চাইলো। তারপর থেকে পরম আত্মীয়ের মত তাঁরা সবাই মিলে এক সঙ্গে বাস করতে লাগলেন। সাতপুরুষ ধরে এই সিংহ ও শৃগাল পরিবার পরস্পর মিত্রভাবে বসবাস করেছিলো।

১৫ [] অলীনচিত্ত জাতক []

প্রাচীনকালে রাজা ব্রহ্মদত্ত বারাণসীতে রাজত্ব করতেন। তখন বারাণসীর কাছাকাছি এক সূত্রধর গ্রাম ছিলো। তারা নৌকায় চড়ে গহণ গভীর বনে যেতো। কাঠ কেটে তৈরী করতো আড়া,তক্তা, খুঁটি, ঘরের কাঠাম। উপযুক্ত পারিশ্রমিক নিয়ে তারা ফরমাশ মতো নানা রকম কাঠের বাড়ি বানাতো। বন ছিল তাদের প্রাণ, সেখান থেকেই গাছের গুঁড়ি চিরে প্রয়োজনমত কাঠসংগ্রহ করতো তারা। এমনিভাবেই জীবিকা নির্বাহ করতো সূত্রধরেরা। সংখ্যায় তারা ছিলো পাঁচশোজন।

একদিনের ঘটনা। সূত্রধরেরা বনের মধ্যে ছাউনি ফেলেছে। কাঠ কাটা আর চেরানোর কাজ চলেছে। এমন সময় একটি হাতি বনের ভেতর দিয়ে যাবার সময় অসাবধানে ছোট কাঠের চেলার ওপরে পা ফেললো। সঙ্গে সঙ্গে হাতীর পায়ের নীচে কাঠের এক ধারালো টুকরো বিঁধে গেলো। ক্রমে পা ফুলে উঠলো। পায়ের ভেতর পুঁজ হলো। দারুণ যন্ত্রণায় কষ্ট হতে লাগলো হাতীর। এ অবস্থায় হাতী যখন ছটফট করছিলো তখনই সে কাঠ কাটার আওয়াজ শুনতে পেলো। সে ভাবলো, "এই মানুষদের সাহায্যেই পায়ের

যন্ত্রণার চিকিৎসা করতে হবে।" এর পরে তিন পায়ে ভর দিয়ে খোঁড়াতে খোঁড়াতে সূত্রধরদের কাছে গেলো। ফোলা পা দেখিয়ে মাটিতে শুয়ে পড়লো। সূত্রধরেরা ফোলা পা হাতির কাছে এগিয়ে গেলো এবং মাংসের মধ্যে ছোট কাঠের কুচিটি দেখতে পেলো। তারা তখন ধারালো ছুরি দিয়ে চিরে ফেলে মাংসের ভেতরকার কাঠের কুচিটি বের করলো। পা থেকে সব পুঁজ বের করে গরম জলে সেঁক দিয়ে ঘা ধুয়ে ফেলে ওষুধ লাগিয়ে দিলো। এতে অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই ঘা শুকিয়ে গেলো হাতীটির।

সেরে ওঠার পর হাতীটি মনে মনে ভাবলো, "এই সূত্রধরেরাই আমার প্রাণ বাঁচিয়েছে। এখন এদের জন্য আমার কিছু করা উচিত।" এর পর থেকেই সে সূত্রধরদের সঙ্গে কাঠ টেনে আনতো। যখন তারা কাঠ চিরতো, কাঠ টেনে আনতো, গুঁড়িগুলো প্রয়োজনমত উল্টেপাল্টে দিতো, তাদের যন্ত্রপাতি বয়ে আনতো। সূত্রধরেরাও কৃতজ্ঞতাবশত তাদের খাওয়ার সময় প্রত্যেকে একটি করে অন্নপিণ্ড দিতো। এমনি করে হাতী রোজ পাঁচশো অন্নপিণ্ড খেতে পেতো।

এই হাতীর সম্বশ্বেত ও আজানেয় নামের দুই ছেলে ছিলো। একদিন সে চিন্তা করলো, "আমি এখন বুড়ো হয়েছি। আর খাটতে ইচ্ছে করেনা। আমার এক ছেলেকে বরং সূত্রধরদের কাজে লাগিয়ে দেবো। আমি ও স্বচ্ছন্দে চলে ফিরে বেড়াতে পারবো তাহলে।"

এরপর একদিন কাউকে কিছু না বলে হাতী চলে গেলো গভীর বনে তার আস্তানাতে ফিরে এলো এক পুত্রকে সংগে করে। সূত্রধরদের কাছে এসে বললো, "এই আমার পুত্র আপনারা চিকিৎসা করে একদিন আমার প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন। আমি সেই ঋণ শোধ করবো আমার এই পুত্রকে আপনাদের দান করে। আজ থেকে আমার এ ছেলে আপনাদের পরিচর্য্যা করবে।" এর পরে সে তার ছেলেকে সূত্রধরদের কাছে রেখে বনে চলে গেলো। সেই থেকে সেই হস্তীপুত্র সূত্রধরদের সকল নির্দেশ মেনে কাজ করতো। তারাও যুবক হাতীকে

খাবার জন্য প্রত্যেকে এক এক পিণ্ড অন্ন দান করতো। এইভাবে প্রত্যহ পাঁচশো অন্নপিণ্ড বরাদ্দ হলো হাতীর খাবার জন্য।

সারাদিন সমস্ত কাজের শেষে অজানেয় হস্তীটি নদীতে গিয়ে জলকেলি করতো। সূত্রধরদের ছেলেরা হাতীটির সঙ্গে খেলা করতো। ছেলেমেয়েরা নির্ভয়ে তার শুঁড়, কান, লেজ ধরে টানতো।'

ভদ্রবংশে জন্মেছে এমন হাতী, ঘোড়া বা মানুষ কেউই জলে মলমূত্র ত্যাগ করেনা। এই হাতীটি ও প্রয়োজন হলে জলের উপরে ডাঙ্গাতে উঠে মলমূত্র ত্যাগ করতো। কখনও জল অপবিত্র করতো না।

একদিন প্রচণ্ড বৃষ্টিপাত হলো। নদীর ওপর থেকে হাতীর একটুকরো শুকনো মল বৃষ্টির জলে ধুয়ে নদীতে এসে পড়লো এবং ভাসতে ভাসতে বারাণসীর ঘাটে গিয়ে লতাগুল্মের ভেতর আটকে রইলো।

এদিকে রাজার হস্তীশালের পাঁচশো হাতী নদীর ঘাটে চান করতে এলো। কিন্তু মাহুতের শত বকুনিতে ও জলে নামতে চাইলোনা কেউ। বরঞ্চ হুদ্দাড় করে পালিয়ে গেলো। মাহুতেরা ধারণা করলো নদীর জল দূষিত হয়েছে, শোধন করা না হলে হাতীরা জলে নামবেনা। মাহুতেরা গুল্মের ভেতর আজানেয় হস্তীর মল দেখতে পেয়ে কলসীতে পুরলো। সেই মলখণ্ড গুলে হাতীদের গায়ে ছিটিয়ে দিলো।

রাজার হস্তীবিশেষজ্ঞ রাজাকে জানালেন, "মহারাজ এই আজানেয় হাতীটা খুঁজে এনে আপনার কাজে লাগালে খুবই উন্নতি হবে। হাতীটা খুবই পয়মন্ত।"

অনুসন্ধান করে রাজা নিজেই তাঁর পাত্রমিত্র সহ সূত্রধরদের কাজের জায়গাতে গেলেন। হাতীটা তখন জলনিয়ে খেলছিলো। রাজার ভেরীর শব্দ শুনতে পেয়ে, উঠে এসে সূত্রধরদের পাশে এসে দাঁড়ালো।

সূত্রধরেরা রাজার কাছে আভূমিনত হয়ে দাঁড়ালো। বললো,

"মহারাজ যদি কাঠের দরকার হয়ে থাকে তবে এত কষ্ট করে নিজে আসার কী দরকার ছিলো ; লোক পাঠালেইতো হতো। রাজপ্রাসাদেই পৌঁছে দিতাম।"

"না। না। আমি কাঠের জন্য আসিনি। এই অজানেয় হাতীটা আমি রাজধানীতে নিয়ে যেতে চাই।" রাজা বললেন।"
"এ আপনারই হাতী। আপনি স্বচ্ছন্দে নিয়ে যান মহারাজ।" সূত্রধরেরা রাজাকে হাতীটি দান করে দিলে কি হবে, হাতীটা কিন্তু রাজার সঙ্গে যেতে চাইলো না কিছুতেই। রাজা তখন হাতীকে জিজ্ঞেস করলেন, "কি হে হস্তীপুত্র! আমি তোমার জন্য কি করলে খুশী হও তুমি?"

তখন হাতী বললো, "মহারাজ এই সূত্রধরেরা এতদিন আমার জন্য যা ব্যয় করেছে, এদের তা ফিরিয়ে দিন। এ ছাড়াতো, আমি এখান থেকে চলে যেতে পারি না—সেটা অধর্ম হবে।" রাজা সূত্রধরদের জন্য এক লক্ষ কার্ষাপণ দিতে আদেশ করলেন। এছাড়া প্রত্যেক সূত্রধরকে এক জোড়া কাপড় এবং তাদের স্ত্রীদের জন্য একখানা করে শাড়ি দিলেন। উপরন্তু সূত্রধরদের ছেলেমেয়েদের উপযুক্ত ভরণপোষণ শিক্ষার ব্যবস্থাও করে দিলেন তিনি।

রাজা সানন্দে হাতী নিয়ে রাজধানীতে ফিরে গেলেন। সমস্ত রাজধানী ও হস্তীশালা সুশোভিত করা হলো। নানারকম অলঙ্কার ভূষিত আজানেয় হস্তীর পিঠে চড়ে স্বয়ং রাজা সারা শহর প্রদক্ষিণ করলেন। সারা রাজ্যে ঘোষণা করে দেওয়া হলো যে রাজার বন্ধুর মতই সমাদৃত হবে এই আজানেয় হাতী। হাতী আসার কিছুদিনের মধ্যে রাজা সমস্ত জম্বুদ্বীপের অধিপত্য লাভ করলেন।

বোধিসত্ত্ব জন্মানোর কিছু আগেই রাজা মারা গেলেন। আজানেয় হস্তীকে রাজার মৃত্যু সংবাদ জানানো হলোনা। তার পক্ষে এ শোক সামলানো খুবই কঠিন হতো না হলে।

এদিকে প্রতিবেশী কোশলরাজ বারাণসী রাজার মৃত্যু সংবাদ

পাওয়া মাত্রই অনেক সৈন্যবাহিনী নিয়ে বারাণসী নগর অবরোধ করলেন। তখন নগরবাসীরা সবাই মিলে কোশলরাজকে অনুরোধ জানালো, "আমাদের রানীমার" দিন সাতেক পরেই ছেলে হবে। যদি ছেলে হয় তবে আমরা আপনার সংগে যুদ্ধ করে রাজ্য রক্ষা করবো। আর যদি মেয়ে হয় তবে বিনা বাধায় রাজ্য ছেড়ে দেবো আপনাকে। আপনি দয়া করে এই কদিন অপেক্ষা করুন" কোশলরাজ সম্মত হলেন প্রস্তাবে। সাতদিন পরে মহিষীর এক পুত্র হলো। কুমার জন্মেই অনেক লোকের মন জয় করে নিলেন বলে তাঁর নাম হলো "অলীনচিত্ত" এই কুমারই বোধিসত্ত্ব।

অলীনচিত্ত কুমার জন্মানোর পরেই কোশল-রাজের সংগে যুদ্ধ বেঁধে গেলো বারাণসী রাজ্যের। উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে বিপুল সেনাবাহিনী নিয়েও একের পর এক যুদ্ধে পরাজিত হতে লাগলো বারাণসীর অধিবাসীরা।

তখন মহিষীর আদেশক্রমে রাজার মৃত্যু সংবাদ এবং যুদ্ধে পরাজয়ের সংবাদ জানানো হলো আজানেয় হস্তীকে। মঙ্গলহাতী সব শুনলো। মন্ত্রীরা হাতীকে বর্ম, অলঙ্কার পরিয়ে যুদ্ধসাজে সাজিয়ে নগরের দ্বার খুলে দিলো। নগরের বাইরে বেরিয়ে মেঘগর্জনের ভয়ংকর বৃংহণে মঙ্গলহাতী কোশলরাজের শিবিরের দিকে ছুটলো। আচমকা এই প্রচণ্ড শব্দে শত্রুসৈন্য ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পালালো। চুলের মুঠো ধরে শুঁড়ে তুলে নিল কোশলরাজাকে। তার পরে তাকে এনে বোধিসত্ত্বের পায়ের নীচে রেখে দিলো। তখন কেউ কেউ কোশলরাজকে প্রাণে মারতে চাইলে মঙ্গল হাতী বাধা দিলো। কোশলরাজকে সতর্ক করে দেওয়া হলো, ভবিষ্যতে সে যেন কখনও আর বারাণসী আক্রমণ করার চেষ্টা না করে। তা হলে মৃত্যু অনিবার্য্য। কাশীরাজকুমার শিশু হলেও তার অভিবাবক হিসাবে মঙ্গলহাতী এখনও বর্তমান। সে তার পিতৃতুল্য।

এম্নিভাবে সমস্ত জম্বুদ্বীপের অধিকার বহাল রইলো কাশীকুমারেরা

বোধিসত্ত্বের আর কোন প্রতিদ্বন্দ্বী রইলো না। বড় হওয়ার পর তাঁর নাম হলো 'অলীনচিত্তরাজ'। তিনি সুখেশান্তিতে রাজত্ব করতে লাগলেন। এমিকরে একজন বিজ্ঞ মানুষের মতই মঙ্গল হাতী বোধিসত্ত্বের একান্ত আপনজন হয়ে উঠলো।

১৬ [] তিন্দুক জাতক []

প্রাচীনকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব বানর হয়ে জন্মেছিলেন। হিমবন্ত প্রদেশে হাজার হাজার বানরের সঙ্গে থাকতেন তিনি। কাছেই ছিল এক গ্রাম। সেখানকার গাব গাছে প্রচুর সুমিষ্ট ফল ফলতো। গাবগাছের বাগান ঘেরা তো থাকতোই, তার উপরে পাহারাদার ও থাকতো। অথচ গাছে এত ফল ধরেছিলো যে, বানরেরা খাওয়ার জন্য ছটফট করেছিলো। তারা একটি বানরকে পাঠালো লোকজনের পাহারার সঠিক খবর জেনে আসতে। বানরটি খবর নিয়ে এলো, দিনের বেলাতে অনেক লোক বাগানে থাকে। তবে রাতে কোন পাহারা থাকেনা। তবে গ্রামে এখন প্রচুর লোকজন রয়েছে! বোধিসত্ত্ব বানরদের দলপতি, তাই বিপদের আশঙ্কা থাকলেও তিনি বানরদের আগ্রহে বাধা দিলেন না। নিজেও সঙ্গী হলেন।

গভীর রাতে চাঁদের আলোয় গাবের বাগানে বানরদের হাট বসে গেলো। বাগানে ফলাহারে মেতে উঠলো বানরেরা। এদিকে রাতের শেষের দিকে একজন গ্রামবাসীর হঠাৎই ঘুম ভেঙ্গে গেলো। ঘরের বাইরে খোলা হাওয়ায় পায়চারী করতে গিয়ে লোকটির নজরে এলো বানরেরা সমস্ত গাব খেয়ে নিচ্ছে। হৈ-চৈ করে সমস্ত লোকজনকে জাগিয়ে তুললো সে। লাঠিসোটা বল্লম হাতে বানরদের ঘিরে

ফেললো গ্রামবাসীরা। পালানোর কোন উপায় রইলোনা দেখে ভয়ে কাঁপতে লাগলো সমস্ত বানরেরা। এখন সবাই বোধিসত্ত্বকে আশ্রয় করে নির্ভয় হয়ে স্থির রইলো। বোধিসত্ত্ব সবাইকে এক জায়গায় জড়ো হতে বল্লেন। হিসেব করে দেখা গেলো বোধিসত্ত্বের ভাগ্নে সেনকনাম যার, সে সংগে আসেনি। বানরেরা যখন ফল খাওয়ার জন্য আসছিলো তখন সেনক ঘুমোচ্ছিলো।

বোধিসত্ত্ব বল্লেন, "সেনক যখন আসেনি—তখন চিন্তার কোন কারণ নেই। একটা না একটা উপায় সে বের করবেই।"

গ্রামবাসীরা বানরদের ঘিরে রইলো সকাল হওয়ার অপেক্ষায়। এদিকে সেনক ঘুম ভেংগে যখন দেখলো কেউ-ই নেই, তখন সে মানুষের গ্রামের দিকে অগ্রসর হতে লাগলো। গ্রামের কাছাকাছি হতেই সে লাঠিহাতে গ্রামের লোকদের উত্তেজিত পদচারণা দেখতে পেলো। সেনক বুঝতে পারলো বানরদের মহাবিপদের ব্যাপারটা। তখন সে জ্বলন্ত কাঠ হাতে করে গ্রামের পেছনদিকে, যে দিক থেকে বাতাস বইছিলো, সেই দিকে গিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলো গ্রামবাসীদের ঘরে।

গ্রামবাসীরা বানর মারা ছেড়ে আতঙ্কে দৌড়ালো ঘরের আগুন নেভাতে। ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলো তারা। বানরেরা এই সুযোগে প্রাণ নিয়ে পালালো। কিন্তু কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ প্রত্যেক বানর সেনকের জন্য এক একটি ফল আনতে ভুললো না। এম্নিভাবে বন্য বানরেরা পর্যন্ত প্রমাণ করলো তারাও অকৃতজ্ঞ হতে শেখেনি।

১৭ [] কুরঙ্গমৃগ জাতক []

প্রাচীনকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব কুরঙ্গ মৃগ হয়ে জন্মেছিলেন। এক মনোরম সরোবরের তীরে লতাপাতার এক ঝোপে থাকতেন তিনি! সরোবরের ধারে এক উঁচু গাছে থাকতো এক বক, আর সরোবরের জলে থাকতো এক পুরোনো কচ্ছপ। বক, কচ্ছপ আর বোধিসত্ত্বের মধ্যে অন্তরঙ্গ বন্ধুত্ব ছিলো। সবাই মিলেমিশে সুখেই দিন কাটাচ্ছিলো।

এদিকে একদিন এক ব্যাধ বনে ঘুরতে ঘুরতে সরোবরের তীরে এসে বোধিসত্ত্বের পায়ের চিহ্ন দেখতে পেলো। লোভী ব্যাধ লোহার জালের তৈরী ফাঁদ পেতে রেখে গেলো। বোধিসত্ত্ব জল খেতে গিয়ে ফাঁদে আটকে গেলেন। আর্তনাদ করতে লাগলেন করুণস্বরে। জল থেকে উঠে এলো কচ্ছপ। গাছের মগডাল থেকে নেমে এলো বক। পরামর্শ চললো—কেমন করে কীভাবে বোধিসত্ত্বকে ফাঁদ থেকে মুক্ত করা যায়। তখন বক বললো, "ভাই কচ্ছপ তোমার দাঁতে ধার রয়েছে তুমি লোহার জাল কাটতে থাকো। আর যাতে তাড়াতাড়ি ব্যাধ না আসতে পারে আমি তার ব্যবস্থা করবো।"

তখন কচ্ছপ জাল কাটতে লাগলো। আর বক গিয়ে হাজির হলো ব্যাধের বাড়ির সামনে। অস্ত্রশস্ত্র হাতে নিয়ে ব্যাধ যেইনা দরজা পেরুতে যাবে, ঠিক তখনই বক দুই পাখা আর পায়ের সাহায্যে বারবার ব্যাধের চোখেমুখে জোরে আঘাত করলো। বেরুনোর মুখে এরকম বাধা পেয়ে ব্যাধ ভাবলো দুর্লক্ষণ। পাখির ডানার ঝাপটা খেয়ে বেরুলে নির্ঘাৎ অমঙ্গল হবে। সে তাই পুনরায় কিছুক্ষণ শুয়ে রইলো। পরে পেছনের দরজা দিয়ে বেরুতে গেলে বক আবারও

একইভাবে ব্যাধকে আঘাত করলো। দিনটা খুবই অপয়া যাবে ভেবে, ব্যাধ ভাবলো কিছুক্ষণ পরে সূর্যোদয় হলেই বেরুবে সে।

যেই মুহূর্তে ব্যাধ বেরুলো সে মুহূর্তেই বক প্রাণপণ বেগে উড়ে এলো সরোবর তীরে। বন্ধু কচ্ছপকে খবর দিলো তাড়াতাড়ি জাল ফাটতে, ব্যাধ এদিকেই আসছে। কচ্ছপের মুখ তখন রক্তাক্ত। সমস্ত দাঁত ব্যথায় জর্জর। তবুও প্রাণপণ চেষ্টায় সে সমস্ত লোহার দড়ি কেটে ফেলেছিলো। কেবল মাত্র একটি দড়ি তখনও বাকী ছিলো। ব্যাধকে দ্রুতবেগে আসতে দেখেই শরীরের সব শক্তি একত্রিত করে দড়ি ছিঁড়ে বোধিসত্ত্ব পালিয়ে গেলেন। বক বসে রইলো গাছের মগডালে। আর কচ্ছপ তখন এত দুর্বল হয়ে পড়লো যে সে ওখানেই মরার মত পড়ে রইলো।

ব্যাধ তখন কচ্ছপটিকে থলেতে পুরে মুখ বেধে গাছের নীচে রেখে দিলো। এদিকে বন্ধু কচ্ছপ ধরা পড়েছে দেখে বোধিসত্ত্ব মনে মনে স্থির করলেন যেমন করেই হোকনা কেন কচ্ছপকে মুক্ত করতে হবে। এদিকে দুর্বলতার ভান করে বোধিসত্ত্ব ব্যাধের কাছাকাছি ঘোরাফেরা করতে লাগলো। ব্যাধ ভাবলো অতি সহজেই দুর্বল হরিণকে ধরে ফেলতে পারবে সে। বোধিসত্ত্বের পেছন পেছন অনুসরণ করে সে গভীর জঙ্গলে এলে—হঠাৎ-ই বোধিসত্ত্ব উল্কার বেগে দৌড়ালেন। অতি দ্রুত কচ্ছপের কাছে এলেন। থলে থেকে কচ্ছপকে বের করে ফেললেন। শিং দিয়ে থলে ছিঁড়ে ফালাফালা করে ফেললেন রাগে।

বন্ধু বকও তখন গাছ থেকে নেমে এলো। বোধিসত্ত্ব তখন বক ও কচ্ছপকে বললেন, "তোমরা আমার প্রাণ বাঁচিয়েছো। প্রকৃত বন্ধুর মত কাজ করেছো তোমরা। ব্যাধ এসে এখনই ধরে ফেলবে তোমাদের। ভাই বক—তুমি এখনই তোমার ছানাপোনা নিয়ে অন্য কোথায় ও চলে যাও! আর ভাই কচ্ছপ তুমিও সরোবরের গভীর জলে ঢুকে পড়ো। না হলে বিপদ বাড়বে।"
বক ও কচ্ছপ বোধিসত্ত্বের কথামত কাজ করলো।

ব্যাধ হাঁপাতে হাঁপাতে সেখানে ফিরে এসে দেখলো, শুধুমাত্র ছেঁড়া থলেটা পড়ে আছে—আর কেউ নেই। পরম সুখে আত্মীয় বন্ধুর মত দিন কাটাতে লাগলেন বোধিসত্ত্ব, কচ্ছপ ও বক। সত্যিকারের বন্ধু হলে বন্ধুর জন্য প্রাণ দিতেও কুণ্ঠিত হয় না কথনও।

১৮ [] চুল্লনন্দিক জাতক []

বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব বানর হয়ে জন্মেছিলেন। তাঁরনাম ছিলো মহানন্দিক। তাঁর ছোটভায়ের নাম ছিলো চুল্লনন্দিক। কয়েক হাজার বানরের সংগে হিমবন্ত প্রদেশে বাস করতেন তারা। বানরদের নেতৃত্ব করা ছাড়াও অন্ধ রুগ্না মায়ের রক্ষণাবেক্ষণ করতে হতো তাঁকে।

ফলমূল আহরণ করতে গেলে, তাঁরা সুমিষ্ট ফলমূল অন্য বানর দিয়ে মাকে পাঠাতেন। কিন্তু বানরেরা নিজেরাই সে ফল খেয়ে নিতো, বোধিসত্ত্বের মাকে দিতোনা আর। আর এম্নি করে না খেতে পেয়ে ক্রমশই দুর্বল অস্থিচর্মসার হয়ে পড়লো বোধিসত্ত্বের অন্ধ মা। ক্রমে বোধিসত্ত্ব বুঝতে পারলেন বানরদের রক্ষণাবেক্ষণে থাকলে মাকে বাঁচানো যাবেনা। তাই দুইভাইই দল পরিত্যাগ করলেন মায়ের সেবাশুশ্রূষার জন্য। তাঁরা হিমালয় থেকে নেমে প্রত্যন্ত এক অঞ্চলে বটগাছের তলে বাসস্থান নির্দিষ্ট করলেন!

এদিকে বারাণসীবাসী এক ব্রাহ্মণপুত্র তক্ষশিলায় এক নামী আচার্য্যের কাছে সর্বপ্রকার বিদ্যাশিক্ষা শেষে গৃহে ফেরার অনুমতি চাইলো। ব্রাহ্মণপুত্র ছিলো, খুবই নিষ্ঠুর প্রকৃতির। তার নির্মমতার কথা জানতেন আচার্য্য। আচার্য্য তাকে সাবধান করে বল্লেন, "বৎস, তুমি অতি নিষ্ঠুর। নির্মম প্রকৃতির লোকের চিরদিন কখনও ভালো যায়না। কেননা কোন এক সময়ে তাদের মহাদুঃখ ও মহাবিনাশ

অবশ্যাম্ভাবী। অতএব তুমি নিষ্ঠুর সমাজ ত্যাগ কর। যে কাজে অনুতাপ হয় এমন কাজ কখনও করবেনা।"

ব্রাহ্মণপুত্র বারাণসীতে ফিরে, বিয়ে করে ঘোর সংসারী হয়ে পড়লো। অন্য কোনরকম কাজ খুঁজে না পেয়ে গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য ব্যাধবৃত্তি বেছে নিয়েছিলো সে। বারাণসীর বাইরে এক গ্রানে থাকতো সে। সকালে বেরিয়ে পড়তো তীরধনুক নিয়ে। পশুপাখির মাংস বেচে ভাতের জোগাড় করতো সে।

একদিনের কথা। বনে কোন পশুই দেখতে পেলোনা সেই ব্রাহ্মণ-ব্যাধ। একটা হরিণও চোখে পড়লো না তার। এমন সময় বোধিসত্ত্ব ও তাঁর ছোটভাই মায়ের সংগে যে বটগাছে থাকতেন, তাঁর তলায় এলো সেই পাপিষ্ঠ ব্যাধ। মনে মনে ভাবলো, "দেখা যাক এ গাছে কিছু মেলে কিনা।"

এদিকে দূর থেকে এদিকেই ব্যাধকে আসতে দেখে বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, "আমি ও আমার ভাই বরং লুকিয়ে পড়ি। ব্যাধ নিশ্চয় আমার রুগ্না অসুস্থা বৃদ্ধা মাকে হত্যা করতে চাইবেনা।" বোধিসত্ত্ব ও তাঁর ভাই আড়ালে লুকিয়ে রইলেন।

কিন্তু নিষ্ঠুর ব্যাধ অন্ধা জরাজীর্ণা বানরীকে দেখে ভাবলো, "খালি হাতে ফিরবো কেন? তার চেয়ে বানরীকে মেরেই আজকের দিনটা চালিয়ে নেবো।" ব্যাধ তীর ধনুক নিয়ে প্রস্তুত হলো! এদিকে বোধিসত্ত্ব দেখলেন, ব্যাধ খুবই নৃশংস প্রকৃতির, দয়ামায়া বলে কিছু নেই। তখন তাঁর ভাইকে বললেন, "ভাই চূল্লনন্দিক, লোকটা দেখছি মাকে না মেরে ছাড়বেনা। তুমি মায়ের শুশ্রূষা সেবাযত্ন করো ঠিকমত। আমি ব্যাধের শিকার হবো— তবুওতো মায়ের প্রাণ বাঁচাতে পারবো।"

বোধিসত্ত্ব ব্যাধের সামনে এসে দাঁড়ালেন, "মহাশয়, দয়া করে আমার অন্ধ মাকে মারবেন না। মায়ের জীবনের বিনিময়ে আমাকে মারুন আপনি।" ব্যাধ এই প্রস্তাবে রাজী হলো নিষ্ঠুর ব্যাধ

বোধিসত্ত্বকে তীরবিদ্ধ করেই থামলোনা, তাঁর বৃদ্ধা মাকে মারার জন্য পুনর্বার ধনুক তুললো। তা দেখেই চূল্লনন্দিক ব্যাধের সামনে দাঁড়ালো, "দোহাই আপনার, আমার মাকে মারবেন না—আমাকে মারুন। কিন্তু দয়া করে আমার মাকে ছেড়ে দেবেন কথা দিন। আমি আপনার পায়ে পড়ছি, দয়া করে আমার মায়ের প্রাণভিক্ষা দিন…"

কপট ব্যাধ অমায়িক হেসে এবারেও সম্মতি দিলো যে সে কখনই চূল্লনন্দিকের মাকে মারবে না। চূল্লনন্দিক ব্যাধের তীরে বুক পেতে নিলো তার মাকে বাঁচাতে, কিন্তু শেষ রক্ষা হলোনা। নিষ্ঠুর ব্যাধ চূল্লনন্দিককে মেরেই থামলোনা। নৃশংসভাবে অন্ধা বৃদ্ধা অসুস্থা বানরীকে ও মেরে ফেললো আরও বেশী মাংসের লোভে।

বোধিসত্ত্ব, চূল্লনন্দিক ও বৃদ্ধা বানরীকে বাঁকে ঝুলিয়ে নিয়ে, ব্যাধ আনন্দের সংগে বাড়ির পথে চললো। ভাবলো, বানরের সুস্বাদু মাংসে ছেলেমেয়েদের খাওয়াটা খুবই জমবে। জিভে জল চলে এলো তার।

ঠিক সে সময়ে পাপাত্মা ব্যাধের কাঠের ঘরে বাজ পড়লো। বিদ্যুৎ স্পৃষ্ট হয়ে তার স্ত্রী দুই পুত্র ও কন্যা মারা পড়লো। ঘরের আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেলো তারা।

ব্যাধ গ্রামে উপস্থিত হলেই একজন গ্রামবাসী তাকে এ খবর জানালো। স্ত্রী-পুত্রের শোকে মুহ্যমান ব্যাধ কাঁধের বাঁক, মৃত বানর ও প্রিয় তীরধনুক অবহেলায় ছুঁড়ে ফেলে দিলো। সমস্ত জামাকাপড় খুলে পাগলের মত নগ্নদেহে বিলাপ করতে করতে জলন্ত ঘরের আগুনে ঢুকে পড়লো। জলন্ত কাঠের খুঁটি মাথাতে পড়ে চূর্ণবিচূর্ণ হলো তার মাথা। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে চোখের সামনে ভেসে উঠলো তার আচার্য্যের মুখ। মনে পড়লো আচার্য্যের সাবধানবানী:

"নিষ্ঠুরতা ও নির্মমতা ত্যাগ না করলে একদিন মহাদুঃখ ও মহাবিনাশ অবশ্যম্ভাবী।"

১৯ [] বর্দ্ধকি-শূকরি জাতক []

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক অরণ্যে বৃক্ষদেবতা হয়ে জন্মেছিলেন। সেই অরণ্যে সূত্রধরেরা কাঠ সংগ্রহের জন্য যেতো। একবার একজন সূত্রধর কাঠ কাটতে গিয়ে বনের মধ্যে গর্তে পড়ে থাকা একটি শূকরছানা দেখতে পেলো। মমতার বশবর্তী হয়ে সে শূয়োরের বাচ্চাটিকে বাড়িতে নিয়ে এলো। যত্ন করে নিজের ছেলের মতন পালনপোষণ করতে লাগলো।

সূত্রধরের আদর-যত্নে ও স্নেহমমতায় সেই ছোট্ট শূয়োরছানাটি হয়ে উঠলো বিশাল চেহারার এক কালো দৈত্য বিশেষ। রক্তাভ ক্ষুদে ক্ষুদে চোখ আর বাঁকানো ধারালো দাঁতে শূয়রটি হয়ে উঠলো ভয়ংকর বলশালী। কিন্তু শূয়রটি ছিলো খুবই বাধ্য এবং শান্তশিষ্ট। শূয়র বলেই ডাকতো।

সূত্রধরেরা যখন বনে কাজ করতে যেতো, তখন নানারকমভাবে সাহায্য করতো। এদিকে বর্দ্ধকি শূয়রের পালক-পিতা সূত্রধরের ভয় হলো পাছে কেউ লোভে পড়ে হৃষ্টপুষ্ট এই শূয়রটিকে মেরে খেয়ে ফেলে। সে তাই শূয়রটিকে গভীর জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিলো।

এদিকে শূয়রটি মনের মত থাকার জায়গা খুঁজতে খুঁজতে একটি বড় গুহার সন্ধান পেলো। স্থানটি খুবই ভালো। কাছেই জলের ঝর্ণা। আর ফলমূলেরও কোন অভাব নেই। এদিকে শূয়রটিকে দেখে রুগ্নজীর্ণ না খেতে পাওয়া চেহারার হাজার হাজার শূয়র তার

সামনে এসে দাঁড়ালো। বর্দ্ধকি শূয়র তাদের বললো, ভালোই হলো, তোমরা এসে গেছ; আমি তোমাদেরই খুঁজছিলাম। আজ থেকে আমরা সবাই মিলেমিশে এই মনোরম জায়গাতে থাকবো। কিন্তু ব্যাপার কি বলতো? এমন রমনীয় জাগাতে থেকেও তোমাদের শরীরের এ হাল কেন? খাওয়ারতো কোন অভাব দেখছিনা এখানে—"

অন্য শূয়রেরা তখন জানালো, "প্রত্যহ সকালে এক বাঘ এখানে আসে আর আমাদের মধ্যে যাকে দেখতে পায় তাকেই ধরে নিয়ে যায়।"

"বাঘটা কি রোজ আসে? না মাঝ মাঝে আসে?"

"রোজই সকালে আসে। কখনও কামাই করে না সে।"

"কটা বাঘ আছে এখানে?"

"একটা বাঘ আছে শুধু।"

"মাত্র একটি বাঘ? আর তোমরা রয়েছো কয়েক হাজার। তবুও বাঘের সংগে পেরে উঠছোনা—আচ্ছা, আমি বাঘকে একহাত দেখছি। তবে একটা কথা আমি তোমাদের যা করতে বলবো তাই করতে হবে কিন্তু তোমাদের—"

বাঘটা থাকতো কাছেই এক পাহাড়ের ওপরে। ওখানে জটাধারী এক ভণ্ডসাধুও থাকতো। বাঘ প্রতিদিন শিকার করে যে মাংস আনতো সেও তা থেকে মাংস খেতো।

বর্দ্ধকিশূয়র রাতের বেলা সমস্ত শূয়রকে শেখালো কেমন করে আক্রমণ করতে হয়, আক্রমন প্রতিরোধ করতে হয়। শেখালো ব্যূহভেদে তিন প্রকার যুদ্ধ। সমস্ত শূয়রেরা সুশৃঙ্খলভাবে শিখলো পদ্মব্যূহ, চক্রব্যূহ ও শকটব্যূহ কাকে বলে।

সকাল না হতেই যুদ্ধের স্থান নির্বাচন করে ফেললো বর্দ্ধকি-শূকর। সে শূকরী ও দুগ্ধপোষ্য শাবকদের মাঝখানে, রাখলো অক্ষম ও বৃদ্ধ রুগ্ন শূকরদেরও জায়গা হলো তার সংগে। দলের পেছনে

ও সামনে রইলো সুস্থ সবল বলবান শূয়রেরা। এছাড়া শূয়রেরা সবাই মিলে বৃত্তাকার গর্ত খনন করে নিলো তাদের ব্যুহর চারপাশে।

সকাল হলে ঘুম থেকে উঠেই বাঘ শূয়রদের সামনে পর্বতের নীচে এসে দাঁড়ালো। কটমট করে তাকিয়ে রইলো শূয়রের পালের দিকে। বর্দ্ধকিশূয়রের কথামত শূয়রেরাও সমান তেজে চোখ পাকিয়ে তাকিয়ে রইলো বাঘের দিকে। বাঘতো খুবই অবাক হলো। সে হাঁই তুললো বিকট শব্দে, শূয়রেরাও তাই করলো। বাঘ মূত্রত্যাগ করলো। শূয়রেরাও করলো। বাঘ এবারে একটু ভাবনায় পড়লো—ব্যাপারটা কি? আগে আমাকে দেখলেই শূয়রেরা পালিয়ে যেতে পথ পেতো না—আজ পালিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা, বরং আমি যা করছি, তাই করে আমাকে সমানে বিদ্রূপ করে চলেছে। ওই উঁচুতে একটা শূয়র দেখছি—এত হৃষ্টপুষ্ট শূয়র আগে দেখিনিতো—এখানে এ ব্যাটাই খুব মোড়লী মেরে বাহাদুরী নিচ্ছে দেখছি। ব্যাপার সুবিধের বলে মনে হচ্ছে না। এখন কেটে পড়ি বরং।" বাঘ আক্রমণ না করে ফিরে গেলো ল্যাজ গুটিয়ে।

এদিকে ভণ্ড তপস্বী বাঘকে ফিরে আসতে দেখে খুবই অবাক হলো। সবশুনে সে বাঘকে ভয় না করে পুনরায় ভীমবেগে আক্রমণ করতে বললো।

বাঘ তার প্রধান শত্রু বর্দ্ধকি শূয়রের ঘাড় লক্ষ্য করে লাফ দিলো বিদ্যুৎগতিতে। কিন্তু তারও চেয়ে দ্রুত গতিতে এক পাশে সরে দাঁড়ালো বর্দ্ধকি শূয়র। লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে বাঘ পড়লো বর্শা ফলকের মত ছুঁচালো এক শক্ত কঠিন পাথরের ওপরে। হাড়গোড় ভেঙ্গে যাওয়ার ব্যথা না মিলোতেই বর্দ্ধকিশূয়র সমস্ত শক্তি দিয়ে বাঘের হৃৎপিণ্ডে তার ধারালো দাঁত বিঁধিয়ে দিলো। তড়িৎগতিতে পুনরায় আক্রমণ করলো বাঘের মাথা। এর ভেতর চতুর্দিক দিয়ে বাঘকে ঘিরে ফেলে কঠিন আক্রমণ শুরু করলো অন্যান্য শূয়রেরা।

ফালা ফালা করে চিরে ফেললো বাঘের শরীর। সমস্ত শূয়রেরা উৎসবের আনন্দে বাঘের সুস্বাদু মাংস খেতে লাগলো।

কিন্তু বিজয় উল্লাস থামার পরেই পুনরায় বিষন্ন হয়ে পড়লো অন্যান্য শূয়রেরা। কারণ ভণ্ড তপস্বী এখনও বেঁচে রয়েছে। বর্দ্ধকি শূয়র তখন জানতে চাইলো, "কি ব্যাপার? তোমরা আবার কি চিন্তা করছো? বাঘতো মরেই গেছে।" "প্রভু, একটা বাঘ মেরে কোন লাভ নেই। যতক্ষণ না কূটতপস্বী মারা যায়। সে ইচ্ছে করলে দশটা বিশটা বাঘ সঙ্গে করে নিয়ে আসতে পারে। সে অতি ভয়ংকর সাধু—।" শূয়রেরা জানালো। "তাই নাকি? বাঘ মেরে ফেললাম; অথচ একজন মানুষকে অত ভয় করে চলতে হবে। চল দেখি সেই সাধুর ডেরা ঘুরে আসি—" বর্দ্ধকি শূয়র সবাইকে নিয়ে সাধুর আস্তানার দিকে চললো।

এদিকে বাঘের ফিরতে দেরী দেখে সাধু নিজেই শূয়রদের আস্তানার দিকে আসছিলো। শূয়রদের তার দিকে আসতে দেখেই সে প্রাণভয়ে দৌড়াতে শুরু করলো। শূয়রেরা ভীষণ বেগে তাড়া লাগালো। সাধু প্রাণ হাতে করে ছুটতে ছুটতে উপায় না দেখে এক ডুমুর গাছে উঠে পড়লো। শূয়রেরা তখন বর্দ্ধকি শূয়রকে একটা উপায় বের করতে বললো। "ঠিক আছে এক কাজ করো সবাই মিলে। মেয়েদের বলো, জল এনে গাছের গোড়ায় ঢালতে। দাঁতাল শূয়রেরা গাছের শেকড় কাটতে থাকবে। বাচ্চারা গাছের গোড়া খুঁড়তে থাকবে আর অন্যান্য সবাই গাছকে ঘিরে দাঁড়িয়ে থাকুক—তাহলেই হবে।" বর্দ্ধকি শূয়রের কথামত সবাই কাজ শুরু করে দিলো।

বর্দ্ধকি শূয়র নিজে গাছের মূল শেকড়টাকে ধারালো দাঁতের আঘাতে কেটে ফেললো। গাছটা মড়মড় শব্দে ভেঙে পড়লে, ভণ্ড সাধুও নীচে পড়ে গেলো। শূয়রেরা সবাই মিলে টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেললো ভণ্ড তপস্বীকে। এর পরে সবাই মিলে শাঁখ

বাজিয়ে, জল ছিটিয়ে, ডুমুর বৃক্ষের কাণ্ডের উপরে বর্দ্ধকি শূয়রকে বসালো এবং অভিষেক উৎসবের শেষে নিজেদের রাজা বলে ঘোষণা করলো। সেই থেকে মানুষের ভেতরেও অভিষেক প্রথা চালু হলো। আর এসবই বোধিসত্ত্ব বৃক্ষদেবতা হয়ে অবলোকন করলেন। আনন্দ পেলেন। মিলেমিশে কাজ করলে যে অসাধ্য সাধন করা যায় শূয়রেরা সেটাই প্রমাণ করলো।

২০ [] মৎসদান—জাতক []

পুরাকালে বারাণসীর রাজা বহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক ধনীবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বড় হয়ে তিনি নিজেও প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে লাগলেন। বোধিসত্ত্বের একটি ছোট ভাইও ছিলো। বোধিসত্ত্বের বাবা মা মারা যাওয়ার পরের ঘটনা। একবার দু'ভাই মিলে পৈতৃক পাওনা টাকা আদায় করতে এক দূর গ্রামে গেলেন।

এক সহস্র কার্যাপণ পাওনা টাকা আদায় হলো। বাড়ি ফেরার পথে তাঁরা দু'ভাই নৌকোর জন্য নদীর ঘাটে বসে অপেক্ষা করছিলেন। নৌকো আসার তখন ও অনেক দেরী ছিলো দেখে তাঁরা রান্নাবান্না করে ওখানেই তাঁদের খাওয়াদাওয়া সেরে নিতে লাগলেন। বোধিসত্ত্ব বেঁচে যাওয়া ভাত না ফেলে দিয়ে, জলের ভেতরে থাকা মাছেদের জন্য নদীদেবতার নামে অর্পণ করলেন। জল-দেবতা খুশী হলেন সৎ, বিবেচক ও ধার্মিক বোধিসত্ত্বের ওপরে। বোধিত্ত্ব নদীর তীরে চাদর বিছিয়ে বিশ্রাম নিতে গিয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন।

বোধিসত্ত্বের ছোট ভাইয়ের স্বভাব চরিত্র মোটেই সুবিধের ছিলোনা। সে ছিলো চোর মনোভাবাপন্ন। তাই বোধিসত্ত্বকে

নিদ্রিত দেখেই মতলব এঁটে ফেললো। বোধিসত্ত্বের কোমরের কাছ থেকে থলে নিয়ে তা থেকে এক সহস্র কার্যাপণ বের করে নিলো সে। একই রকম দেখতে আর একটা থলেতে পাথর কুঁচি ভরে রেখে দিলো।

এর পরে দু'ভাই নৌকোতে উঠে গঙ্গা পারাপার করছিলো। তখন ছোটভাইয়ের কাছেই টাকার থলেটা রাখা ছিলো। সে ইচ্ছে করেই পাথর কুচির থলেটা নদীতে ফেলে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, "দাদা সর্বনাশ হয়েছে! কাহণের থলেটা জলে পড়ে গেছে। কী সর্বনাশ হলো আমাদের—।" "ঠিক আছে কেঁদোনা ভাই, জলে পড়ে গেলেআর কী করবে তুমি। এর জন্য দুঃখ করোনা তুমি—" বোধিসত্ত্ব ছোট ভাইকে সান্ত্বণা দিলেন।

এদিকে বোধিসত্ত্বের মহত্ব দেখে নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভাবলেন, "এই ব্যক্তি মহৎপ্রাণ। আমাকে এর সম্পত্তি রক্ষা করতে হবে দেখছি। তখন তাঁর আদেশে একটি মহামুখ মৎস থলেটা গিলে নিলো।

অন্যদিকে বোধিসত্ত্বের ছোটভাই মনে মনে খুব খুশী। সমস্ত কাহণ তার একার হবে। বোকা দাদাকে ফাঁকি দেওয়া গেলো খুব সহজে। কিন্তু আনন্দ কর্পূরের মতই উবে গেলো তার, যখন সে দেখলো পাথর কুচি ভর্তি থলেটাই তার কাছে রয়ে গেছে। কাহণের থলেটাই নদীতে ফেলে দিয়েছে সে ভুল করে।

এদিকে নদী দেবতার প্রভাববলে সেই মহামুখ মৎস একদিন জেলেদের জালে ধরা পড়লো। জেলেরা মাছ বিক্রির জন্য নগরে এলো। কিন্তু হাজার কাহণ ও সাত মাষা দাম শুনে সেই মাছ কিনতে কেউ সাহসী হলোনা। নগরের লোকেরা জেলেদের ঠাট্টা করলো, "বাপের জন্মেতো এরকম মাছের দাম শুনিনি ভাই। মাছটা কি সোনার?" জেলেরা কোন কথার উত্তর দিলোনা। একসময় জেলেরা বোধিসত্ত্বের বাড়িতে এলো মাছটা বিক্রি করতে। বোধিসত্ত্ব মাছের

দাম জানতে চাইলেন। জেলেরা তাঁকে বললো, "আপনি এ মাছটি কিনুন। অন্য কেউ কিনতে গেলে হাজার কাহণ ও সাত মাষার কম হবেনা কোন মতেই। কিন্তু আপনার কথা আলাদা। আপনি শুধু সাত মাষা দিন—তাহলেই এ মাছ আপনাকে বেচবো।"

বোধিসত্ত্ব জেলেদের সাত মাষা দিয়ে মাছটা কিনে নিলেন। বোধিসত্ত্বের স্ত্রী মাছ কাটার সময় পেটের ভেতরে হাজার কাহনের সেই থলেটা দেখতে পেয়েই বোধিসত্ত্বকে জানালো। তিনি দেখেই তাঁর নিজের টাকার থলে চিনতে পারলেন।

বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, "জেলেরা আমার কাছ থেকে মাত্র সাত মাষা দাম চেয়েছিলো· তবে কি ওরা জেনেছিলো এই হাজার কাহণ আমারই সম্পত্তি। কি কারণে আমি আমার এ হারানো কাহণ ফিরে পেলাম?"

তখন আকাশ থেকে গঙ্গা দেবী দৈববাণী করলেন, "আমি গঙ্গা দেবী। তুমি তোমার বেঁচে যাওয়া ডাল ভাত মাছেদের দেবার সময় তার পুণ্যফল আমাকে দিয়েছিলে। সে জন্যই আমি তোমার সম্পত্তি রক্ষা করলাম। তোমার ভাই পাপিষ্ঠ। অসৎ। ছোট-ভাইকে পুনরায় এ সম্পত্তির অংশ দিতে যেওনা যেন। সব নিজে ভোগ করো। না হলে আবার প্রবঞ্চিত হবে তুমি।"

গঙ্গাদেবীর উত্তরে বোধিসত্ত্ব বল্লেন, "দেবী, কোন অবস্থাতেই আমি আমার ছোট ভাইকে নিরাশ করতে পারবোনা, যত অসৎই হোকনা কেন সে।"

বোধিসত্ত্ব তাঁর ছোটভাইকে পাঁচশো কার্ষাপণ দিয়ে দিলেন। মহৎ লোক কোন অবস্থাতেই তাঁর মহত্ব আর উদারতা ত্যাগ করেন না।

২১ [] মহাশ্বারোহ জাতক []

পুরাকলে বোধিসত্ব বারাণসীর রাজা ছিলেন। তিনি যথাধর্ম জেনে রাজ্য শাসন করতেন। তিনি ছিলেন দাতা। প্রজারঞ্জক এক প্রজাবৎসল রাজা।

একবার প্রত্যন্তবাসীরা বিদ্রোহ ঘোষণা করলে রাজা নিজেই বিদ্রোহীদমনে যুদ্ধযাত্রা করেন। কিন্তু তাঁর সৈন্যরা পরাজিত হলো। তিনি ঘোড়ায় চড়ে পালিয়ে যেতে যেতে ক্ষুধাতৃষ্ণায় কাতর হয়ে এক গ্রামে আশ্রয় নিলেন। কিন্তু যোদ্ধার বেশে রাজাকে ঢুকতে দেখেই গ্রামের সবাই ভয়ে ঘরে গিয়ে দরজা দিলো। শুধুমাত্র একজন লোক পালিয়ে না গিয়ে রাজার সামনে এলো নির্ভয়ে। সে জিজ্ঞেস করলো,—শুনেছি রাজা নাকি নিজে প্রত্যন্ত প্রদেশে বিদ্রোহ দমনে এসেছেন। দেখেতো তোমাকে সৈনিক বলেই মনে হচ্ছে—তা তুমি কি ? তুমি রাজভক্ত না বিদ্রোহী ?"

রাজা উত্তর দিলেন, "ভাই আমি রাজভক্ত।" "আমিও রাজভক্ত। বাঁচালে ভাই। তবে আমার ঘরে চলো, তুমি আমার অতিথি।" এই বলে রাজাকে সেই লোকটি নিজের ঘরে নিয়ে গেলো। লোকটির স্ত্রী নিজের হাতে রাজার পা ধুয়ে দিলো। নিজের হাতে বিছানা করে রাজাকে বিশ্রাম করতে দিলো। আদর যত্ন করে সাধ্যমত ভলো খাবার দাবারও খেতে দিলো রাজাকে। রাজার ঘোড়ার সাজ খুলে ফেলে তাকেও জলটল খাওয়ালো, পিঠে তেল মাখালো। ভালো ঘাস কেটে এনে খেতে দিলো। নদীতে নিয়ে গিয়ে ঘোড়ার গা ধুয়ে আনলো।

এমনিভাবে তিন চার দিন যথাসাধ্যভাবে সে রাজার সেবাযত্ন করলো। অবশেষে রাজার বিদায় নেবার সময় হলো। সেই গ্রামে ছিলো তিরিশজন রাজভক্ত প্রজা। রাজার যাবার সময় সবাই এসে

হাজির হলো রাজাকে বিদায় জানাতে। রাজা যাবার আগে সেই লোকটিকে বল্লেন, "ভাই, আমার নাম মহাশ্বারোহ। যদি কখনও কোন কাজে নগরে যাও, আমার বাড়িতে কিন্তু আসতেই হবে। নগরের দক্ষিণদ্বারে গিয়ে দৌবারিককে জিজ্ঞেস করবে মহাশ্বারোহ কোন বাড়িতে থাকেন, তাহলেই সে তোমাকে সঙ্গে করে আমার বাড়িতে নিয়ে যাবে।" রাজা বিদায় নিলেন।

রাজার সৈন্যরা তখনও নগরের বাইরে তাঁবু ফেলে রাজার ফেরার জন্য অপেক্ষা করছিলো। রাজা ফিরতেই সৈন্যরা আনন্দিত মনে সঙ্গ নিলো তাঁর। রাজা দৌবারিককে ডেকে পাঠালেন নগরে ঢুকেই। বল্লেন, "শোনো, যদি কখন ও প্রত্যন্তবাসী কোন লোক আমার সঙ্গে দেখা করবার জন্য তোমাকে বলে—'মহাশ্বারোহের বাড়ি কোথায়?' তুমি তখন তাকে যত্ন করে আমার কাছে নিয়ে যাবে। বিনিময়ে তুমি পাবে সহস্র মুদ্রা।"

কিন্তু দিন কাটতে লাগলো, সেই প্রত্যন্তবাসী নগরে এলোনা। রাজা তখন সেই গ্রামের কর বাড়িয়ে দিলেন বার বার। তবুও সেই লোকটি এলোনা। করের ভার কমানোর জন্য রাজার কাছে আবেদন করতে।

এদিকে গ্রামের লোকেরা দেখলো, যেদিন থেকে মহাশ্বারোহ গ্রামে এসেছে তারপর থেকেই ক্রমাগত করের বোঝা বেড়ে চলেছে। তারা সবাই দল বেঁধে রাজার আশ্রয়দাতা সেই লোকটার কাছে গেলো। তারা সবাই মিলে তাকে বললো, "যে দিন থেকে তোমার সেই সৈনিক বন্ধু মহাশ্বারোহ গেলো এখান থেকে, তারপর থেকেই করের বোঝা এতো বাড়ছে যে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারছিনা। এখন বরং তুমি একবার নগরে যাও, তোমার বন্ধু মহাশ্বারোহকে ধরে রাজার কাছে তদ্বিরতদারক করে আমাদের করের বোঝা কমিয়ে আনো।" বেশ আমি নগরে যেতে রাজি আছি। কিন্তু শুধু হাতেতো বন্ধুর বাড়িতে যেতে পারবোনা। শুনেছি মহাশ্বারোহের

ছুটি ছেলে। তোমরা তাদের সবার জন্য পোষাক আর গয়নাগাঁটি যোগাড় করে দাও তাহলে।" লোকটির কথাশুনে গ্রামবাসীরা সব ব্যবস্থা করতে রাজী হলো।

এম্নিভাবে জামাকাপড় গয়নাগাঁটি আর তার স্ত্রীর হাতে তৈরী পিঠে-পায়েস নিয়ে সেই প্রত্যন্তবাসী নগরে এসে পৌছালো। সে দৌবারিককে জিগ্যেস করলো, "ভাই মহাশ্বারোহের বাড়ি কোনটা?" দৌবারিক সংগে সংগে তার হাত ধরে তাকে মহাসমারোহে রাজার কাছে নিয়ে গেলো। রাজা তাকে দেখামাত্রই সিংহাসন থেকে উঠে এসে তাকে আলিঙ্গন করলেন। বন্ধুর স্ত্রী ও ছেলেদের কুশল খবর নিলেন। পরে অগ্রমহিষীকে বল্লেন, প্রত্যন্তবাসীর পা ধুয়ে দিতে। মহিষী তাই করলেন। যত্ন করে গন্ধ তেল মাখিয়ে দিলেন পায়ে। রাজা নিজে চেয়ে খেলেন পিঠে—পায়েস। সবাইকে খেতে দিলেন। প্রত্যন্তবাসীর আনা সাদামাটা জামাকাপড় ও অলঙ্কার গ্রহণ করলেন। মহার্ঘ্য হীরেমুক্তোখচিত জড়োয়া রাজবেশ ছেড়ে ফেল্লেন। মহিষীও বেনারসী শাড়ি ও অলঙ্কার ছেড়ে প্রত্যন্তবাসীর আনা মোটা কাপড় পরলেন গহনাতে সাজলেন।

প্রত্যন্তবাসীকে রাজার নাপিত দাড়ি কেটে দিলো। চাকরেরা সুগন্ধী জলে চান করালো। লক্ষমুদ্রা দামের বেনারসী কাপড়ের জামাকাপড় পরানো হলো তাকে। লোভনীয় সুস্বাদু খাবার দাবার খাওয়ার পর রাজা প্রত্যন্তবাসীকে নিয়ে গেলেন রাজসভায়। সকল অমাত্যদের সামনে শপথ করে সারা শহরে ভেরী বাজিয়ে, আনুষ্ঠানিক-ভাবে রাজা প্রত্যন্তবাসী সেই বন্ধুকে অর্দ্ধেক রাজত্ব দান করলেন। তারপর প্রত্যন্তবাসীর স্ত্রীপুত্রকেও লোক পাঠিয়ে নগরে নিয়ে এলেন। তাদের থাকার জন্য রাজকীয় প্রাসাদ বানিয়ে দিলেন। এরপর রাজা ও প্রত্যন্তবাসী দুই অন্তরঙ্গ বন্ধুর মত একত্রে দিন কাটাতে লাগলেন। দু'জনে একসংগে মিলেমিশে রাজ্যশাসন করতে লাগলেন। আনন্দে-আহ্লাদে পাশা খেলে কাটাতে লাগলো দুই বন্ধুর দিনগুলো…।

এদিকে আমাত্যেরা এতে ক্রুদ্ধ হলো। তারা রাজপুত্রকে বললো, "রাজা ওই গাঁয়ের লোকটাকে মাথায় তুলে নাচছেন। আদ্দেক রাজত্ব দিলেন। আমাদেরও হুকুম করেছেন ওই গেঁয়ো লোকটাকে যেন রাজার মতই মাণ্যগণ্য করি। রাজার কি উপকার ওই চাষা লোকটা করেছেন জানিনা—কিন্তু কুমার আপনি সাবধান হোন। নাহলে রাজত্ব থেকে বঞ্চিত হবেন। রাজাকে এ মোহ থেকে মুক্ত করুন। জিজ্ঞেস করুন সব—রাজার ব্যবহারে আমাদের লজ্জায় মাথা কাটা যাচ্ছে কুমার।" রাজকুমার মন্ত্রীদের কথামত রাজাকে অনুরোধ করলেন, "মহারাজ এ আপনি কি করছেন? একজন গেঁয়ে ভূতকে নিয়ে—এ কেমন ব্যবহার আপনার?"

রাজা বল্লেন, কুমার তুমি কি জান, আমি যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালানোর সময়ে কোথায় কীভাবে দিন কাটাচ্ছিলাম?"

"না, পিতা। আমি তা জানিনা।"

"তবে শোন। আমি যখন যুদ্ধে পরাজিত হয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিলাম শত্রুর সৈন্যদের হাত থেকে বাঁচার জন্য—তখন এই লোকটিই আমাকে তার বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছিলো। সে তখন জানতো, আমি সামান্য একজন রাজভক্ত সৈনিক। জানতোনা আমি রাজা। তবুও সে খুবই যত্ন করে আমাকে আতিথেয়তার পূর্ণ মর্যাদা দিয়েছিলো। যে নিজেও রাজভক্ত। সেদিন দুঃসময়ে যে ব্যক্তি আমার এত উপকার করলো, তার প্রতি যথোচিত সম্মান দেখাবোনা কেন বলতে পারো। দেখ—পুত্র যে লোক দানের অযোগ্য ব্যক্তিকে দান করে এবং দানের যোগ্য ব্যক্তিকে দান করেনা, সে বিপদের সময়ে কারুর কাছ থেকে কোনরকম সাহায্য পায়না।" রাজার কথা শুনে রাজকুমার নিজের ভুল বুঝতে পারলো। লজ্জিত হলো অমানুষের মত কাজ করতে যাচ্ছিলো বলে। কখনও অকৃতজ্ঞ হতে নেই।

২২ [] জম্বুক—জাতক []

তখন বারাণসীর রাজা ছিলেন ব্রহ্মদত্ত। বোধিসত্ত্ব তখন জন্মেছিলেন সিংহ হয়ে। হিমবন্তের এক গুহায় তিনি থাকতেন।

একদিন দুপুরবেলা। ঝর্ণার ধারে ক্ষুধার্ত বোধিসত্ত্ব শিকারের আশায় ওৎ পেতে বসেছিলেন। এমন সময় একটা বিরাট দৈত্যাকৃতি কালো কুচকুচে তেল চকচকে মহিষ জল খেতে এলো ঝর্ণাতে। বোধিসত্ত্ব একলাফে মহিষের ঘাড়ে পড়লেন। ঘাড় মটকে মেরে ফেললেন মহিষকে। ধীরে সুস্থে তৃপ্তি সহকারে মোষের মাংস খেয়ে জল খেলেন। ফেরার পথ নিতেই একটি শৃগাল তার সামনে এসে পড়লো। পালানোর সাধ্য নেই দেখে শৃগাল বোধিসত্ত্বের সামনে সটান মাটিতে শুয়ে পড়লো। শৃগাল চাতুরীপূর্ণ গলায় জানালো, "প্রভু, আমার প্রণাম নিন। আমি আপনার সেবা করার অনুমতি পেলে নিজেকে ধন্য মনে করবো।" "বেশ তবে আমার সংগে এসো তুমি।" এ কথা বলে বোধিসত্ত্ব শৃগালকে তাঁর নিজের গুহাতে নিয়ে গেলেন। প্রতিদিন শিকার করে মাংস এনে তাকে খাওয়াতে লাগলেন।

সিংহের শিকার করা অনায়াসলব্ধ মাংস খেয়ে, আরামে থেকে শৃগাল দিনে দিনে বেশ গাট্টাগোট্টা হয়ে উঠলো। মনে মনে খুবই গর্ব হলো শৃগালের। নিজেকে সিংহের মতই শক্তিশালী ভেবে নিলো।

আত্মগর্বে গর্বিত শৃগাল একদিন বোধিসত্ত্বকে বললো, "আমি শুধু বসে বসে আপনার ঘাড়ের ওপর খাচ্ছি। মূর্তিমান গলগ্রহ আমি। অথচ আপনি রোজ শিকার করা মাংস এনে আমায় খাওয়াচ্ছেন। আজ আপনি বিশ্রাম নিন প্রভু, গুহাতেই থাকুন।

আমি গিয়ে একটা হাতী মারছি না হয়—নিজে খেয়ে আপনার জন্য টাটকা মাংস নিয়ে আসছি—।" শৃগালের কথা শুনে বোধিসত্ত্ব শুধু বল্লেন, "তুমি শৃগাল, একথাটা ভুলোনা কখনও। তোমার এ ইচ্ছে ভালো নয়। হাতী মেরে যারা মাংস খায় তাদের কুলে তোমার জন্ম নয়! আমিই বরং হাতী মেরে তোমাকে তার মাংস খাওয়াচ্ছি। তোমার যখন এতো হাতীর মাংস খেতে ইচ্ছে হয়েছে। কিন্তু তুমি যেও না। হাতী মহাকায় জন্তু। প্রচণ্ড বলশালী। যা তোমাকে মানায় না, তা যেন ভুলেও করতে যেও না। হাতী মারার মত ক্ষমতা তোমার নেই। বৃথা আস্ফালন করো না।"

শৃগাল সিংহের নিষেধ না শুনেই গুহা থেকে বেরিয়ে পড়লো। বার তিনেক হুক্কা-হুয়া—হুক্কু-হুক্কু—বলে চেঁচালো! পর্বতের পাদদেশে তাকিয়ে সে কৃষ্ণকায় এক মহাদাঁতাল হাতীকে দেখেই তার মাথা লক্ষ্য করে ঝাঁপ দিলো। কিন্তু মাথাতে বা পিঠে না পড়ে, পড়বি তো পড়, একেবারে হাতীর পায়ের সামনে। ব্যস, আর যায় কোথায়! হাতী অবহেলাভরে তার সামনের পা শৃগালের মাথার ওপরে একটু রাখলো শুধু। শৃগালের মাথা চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেলো। করুণ আর্তনাদ করতে করতে মারা পড়লো সে। হাতী ক্রৌঞ্চনাদ করতে করতে চলে গেলো। কেঁপে উঠলো সারা জঙ্গল।

বোধিসত্ত্ব হস্তীগর্জন শুনে ছুটে এলেন দ্রুত পর্বতশিখর থেকে, শৃগালকে মৃত অবস্থায় ছিন্নভিন্ন পড়ে থাকতে দেখলেন। দুঃখ পেলেন মনে। ভাবলেন, নিজের অহেতুক গর্বেই শৃগালের অকাল মৃত্যু হলো। কিছুতেই নিষেধ শুনলোনা।

কখনোই বেশী দর্প ভালো নয়, তাতে শুধু পতনই হয় দ্রুত।

২৩ [] পূতিমাংস—জাতক []

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় হিমালয় পর্বতের গুহাতে শত শত বন্য ছাগল বাস করতো। এদের কাছ থেকে অল্প দূরেই থাকতো পূতিমাংস নামে এক শৃগাল আর তার বউ—নাম যার রেণী।

একদিন দুপুরবেলার ঘটনা। পূতিমাংস আর তার বউ রেণী খাদ্যের সন্ধানে ঘুরছিলো। এমন সময় হৃষ্টপুষ্ট নধরকান্তি ছাগলের পাল দেখে জিভে জল চলে এলো তাদের। মনে মনে রেণী ভাবলো, "যে কোন উপায়েই হোক এদের মাংস খেতেই হবে। না হলে বেঁচে থেকে কোন সুখ নেই।"

পূতিমাংস ছিলো খুবই ধুরন্ধর শয়তান। সে নানারকম কৌশলে প্রায় প্রতিদিনই এক একটি ছাগলকে দল থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে বধ করতো। শৃগাল ও শৃগালী দু'জনেই দিন দিন সবল আর মোটাসোটা হয়ে উঠছিলো। সুস্বাদু ছাগলের মাংস খেয়ে দিন কাটতে লাগলো তাদের পরম আনন্দে। এদিকে আস্তে আস্তে ছাগলেরা কমে আসতে লাগলো সংখ্যাতে।

ছাগলদের ভেতর মেড়ীমাতা নামের এক ছাগী ছিলো খুবই বুদ্ধিমতী ও সুন্দরী। শৃগালরা স্বামী-স্ত্রীতে অনেক কৌশল খাটিয়েও কিছুতেই মেড়ীমাতাকে মারতে পারছিলোনা। শৃগাল ও শৃগালী তখন দুজনে মিলে পরামর্শ করলো। শৃগাল শেষে এক উপায় খুজে বের করলো, "দেখ বউ মাথায় একটা বুদ্ধি এসেছে। তুমি গিয়ে ছাগীটার সংগে সই পাতাও। যখন ছাগী সুন্দরী তোমাকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতে শুরু করবে তখন আমি মরার ভাণ করে

একদিন মাটিতে নিশ্চল হয়ে শুয়ে থাকবো। তুমি ছাগীটার কাছে যাবে। বলবে, সই—আমার মহা সর্বনাশ হয়েছে। আমার স্বামী আর বেঁচে নেই, আমি বিধবা হলাম। তুই ছাড়া আমার আর কে আছে বল। তুই একটু চল, দু'জনে মিলে সৎকারের জোগাড় করি।" —এভাবে কান্নাকাটি করে ভুলিয়ে-ভালিয়ে তুমি কোনরকমে ছাগীটাকে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে আসবে, আমি তখন লাফ দিয়ে উঠেই ছাগীর টুঁটি ছিঁড়ে ফেলবো।"

শৃগালী, শৃগালের পরামর্শমতো উপযাচক হয়ে ছাগীর সংগে বেশ ভাব জমিয়ে ফেললো। সই পাতিয়ে নিলো ওর সংগে। ক্রমে শৃগালী ছাগীর বিশ্বাস ভাজন হয়ে উটলো!

একদিন সুযোগ বুঝে একথা সেকথা বলার পর শৃগালী বললো, "জানিস সই, আজ আমার স্বামীর শরীরটা ভালো দেখে আসিনি। আজ চলিরে—"একথা বলেই শৃগালী বাড়ি ফিরে এলো।

পরদিন পূর্বপরিকল্পনামত শৃগালী কাঁদতে কাঁদতে আছাড়ি-পাছাড়ি খেয়ে আকুলিবিকুলি করতে করতে ছুটতে ছুটতে ছাগীর বাড়ি এলো। শেখানো বুলি শুনে ছাগীর মনটা খুবই নরম হয়ে উঠলো। তবুও শৃগালীকে সে একবার বললো, "আমার তোর বাড়িতে যেতে ভয় করে সই। তোর স্বামী বড় লোভী আর নিষ্ঠুর। আমার সমস্ত আপনজনকে মেরে খেয়েছে। কিছু মনে করিস না সই, আমি যেতে পারবো না।" কিন্তু শৃগালী ছাড়ার পাত্রী নয়। সে বারবার কাকুতিমিনতি করে চললো, "যে মরে গেছে সে তোর আর কি ক্ষতি করবে সই। এতো করে বলছি, চল না সই একবার—"

তখন ছাগী ভাবলো, সত্যি সত্যি-ই হয়তো ধূর্ত শৃগালের মৃত্যু হয়েছে। সে তখন শৃগালীর সঙ্গে তার বাড়ির দিকে চললো। কিন্তু সব সময়েই সে চিন্তা করছিলো, "কি জানি কি ঘটবে আজ কপালে।" সাবধানতাবশতঃ সে শৃগালীর পেছন পেছন যেতে যেতে

চারদিকে ভালো করে নজর রাখছিলো, যাতে করে শৃগালের গতিবিধি বুঝতে পারে। শৃগাল শৃগালীর পায়ের শব্দ পেয়ে ভাবলো, ছাগী এসেছে। তাই মাথা তুলে তাকিয়ে যেই দেখলো শৃগালীর পেছনে ছাগী আসছে, তখনই পুনরায় মরার ভান করে পড়ে রইলো।

ছাগী কিন্তু দেখেই বুঝলো, শৃগাল মরেনি। তাকে মারার জন্যই এরকম চালাকী করেছে। তখন সে দ্রুত লাফে পালিয়ে যেতে লাগলো। শৃগালীর শত অনুনয়বিনয়ে কান দিলো না।

শৃগালী রাগে ফেটে পড়লো শৃগালের ওপর। শৃগালের বেশী চালাকীর জন্যই ছাগীর সুস্বাদু মাংস খাওয়া গেলনা।

কিন্তু শৃগাল পূতিমাংসের যোগ্য স্ত্রী হলো রেনী শৃগালী। "আমি আর একবার শেষ চেষ্টা করে দেখছি। স্বামী, তুমি ভেঙ্গে পড়োনা।" এই বলে রেনী শৃগালী একদিন সকালে গিয়ে হাজির হলো ছাগী সুন্দরীর বাড়িতে। "সই, তুই সেদিন যেইমাত্র আমাদের বাড়ির সীমানায় পা রাখলি, তাতেই আমার স্বামীর জ্ঞান ফিরে এলো। কি উপকারই না সেদিন তুই করে এলি। আমার স্বামী শুধুমাত্র তোর পুণ্যেই বেঁচে উঠেছেরে। চল না সই, একবার আমার স্বামীকে দেখে আসবি শুধু।"

কিন্তু এবারে আর ছাগী মিষ্ট কথায় ভুললো না। সে পরোক্ষভাবে শৃগালীকে শিক্ষা দেবার কথা ভাবলো।

"যাবোরে সই। নিশ্চয়ই যাবো একদিন তোর বাড়ি। এভাবে যেতে বড়ো লজ্জা করে। চাকরবাকর সঙ্গে নিয়ে নানারকম খাবার দাবার আর হরিণের মিষ্টি মাংস নিয়ে যাবো কেমন! তুই বরং এখন থেকে জোগাড় যন্ত্র শুরু করে দে। আমার সঙ্গে চারটে কুকুর-চাকর যাবে। মালিক চতুরাক্ষ, জম্বুক আর পিঙ্গিক যে সে খুকুর নয় স্বয়ং যমরাজ ও এদের এড়িয়ে চলে। এদের এক একজনের সঙ্গে আবার পাঁচশো কুকুর থাকে। দেখিস ক্ষুধার সময় খাবার না পেলে এরা কিন্তু ভীষণ খেপে যাবে—তখন কিন্তু তোকে

আর তোর স্বামীকে সামনে পেলেও খেয়ে নিতে পারে ওরা। আমার কথাও শুনবেনা। যা দাঁড়িয়ে রইলি কেন, অতিথি সৎকারের আয়োজন কর গিয়ে—।" ছাগীর একথা শুনে ভয়ে অন্তরাত্মা পর্যন্ত কেঁপে উঠলো শৃগালীর।

ভীতা শৃগালী কোনরকমে বললো, "থাক থাক! কষ্ট করে তোকে আর আমার বাড়ীতে যেতে হবেনা সই। শেষে আবার চোর ডাকাত না তোর বাড়ি লুঠ করে নেয়। আমি এমনিতেই তোর কথা গিয়ে ওকে বলবো—কেমন—আজ চলিরে সই, পরে আসবো।"

মরণভয়ে ছুটে পালালো শৃগালী। তার স্বামীকে সব কথা বলে, সে মুহূর্তেই সেখান থেকে অনেক অনেক দূরে গভীর ঘন জঙ্গলে পালিয়ে গেলো। বোধিসত্ব তখন বৃক্ষদেবতা হয়ে সমস্ত ব্যাপারটাই ঘটতে দেখলেন অলক্ষ্যে থেকে। এম্নিভাবে বেশী লোভ করতে গিয়ে নিজের নিরাপদ আশ্রয় ছেড়েও পালিয়ে যেতে হলো শৃগাল আর শৃগালীকে। ধূর্ত্ত শৃগালের সংগে ধূর্ত্ততা করে ঠিক কাজই করেছিলো ছাগী মেড়ীমাতা। কখনও বেশী লোভ করতে নেই।

২৪ [] দর্দ্দর-জাতক []

হিমবন্ত প্রদেশে দর্দ্দর নামে এক পর্বত ছিলো। সে পর্বতের পাদদেশে দর্দ্দর নাগরা বাস করতো। পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব এই দর্দ্দরনাগদের রাজা শূরদর্দ্দরের বড় ছেলে হয়ে জন্মান। তখন বোধিসত্ত্বের নাম ছিলো মহাদর্দ্দর। তাঁর ছোট ভাইয়ের নাম ছিলো খুল্লদর্দ্দর। খুল্লদর্দ্দর ছিলো ভীষণ রাগী গোঁয়ার। কথায় কথায় মারধর করতে ভালোবাসতো সে।

সে অন্যান্য নাগকন্যাদের গালিগালাজ করতো, মারতেও দ্বিধা করতো না।

নাগরাজ ছোট ছেলের অত্যাচারে অতিষ্ট হয়ে তাকে রাজপুরী থেকে নির্বাসিত করার আদেশ দিলেন। কিন্তু বোধিসত্ব পিতাকে অনুরোধ করলেন ছোট ভাইকে যেন ক্ষমা করে দেওয়া হয়। পিতা পুত্রের কাতর অনুরোধে ক্ষমা করলেন। কিন্তু খুল্লদর্দ্দর শোধরালো না। পিতা এবারেও তাকে নির্বাসন দণ্ড দিলেন না। বোধিসত্ত্বের অনুরোধে এবারেও ক্ষমা করলেন ছোট ছেলেকে। কিন্তু তৃতীয়বার খুল্লদর্দ্দরের আচরণে এতো রেগে গেলেন যে বোধিসত্ত্বের শত অনুরোধেও ক্ষমা করলেননা। কিন্তু বোধিসত্ত্বের দৃঢ়তা দেখে আদেশ দিলেন, "মহাদর্দ্দর, তোমারই জন্য আমি এই দুরাচার কুপুত্রকে নগরী থেকে নির্বাসন দিতে পারছি না। যাও, তোমরা দু'জনেই নাগপুরী থেকে বেরিয়ে যাও—তিন বছর ধরে বারাণসীতে মলপূর্ণভূমিতে যেয়ে থাকবে। এই আমার আদেশ।"

অভিশপ্ত নাগপুত্রদ্বয় মলভুমিতে জলের মধ্যে বাস করতে লাগলো। দুই ভাই যখন জলের ধারে খাবার খুঁজতে যেতো, তখন গ্রাম্য বালকেরা তাদের দেখতে পেলেই ঢিল ছুঁড়তো নির্মম-ভাবে। লাঠি পেটা করার চেষ্টা করতো, নির্বিষ ঢোঁড়া সাপ ভেবে। শত মারধর গালিগালাজ খেয়েও উত্তেজিত হতেন না বোধিসত্ব। দাদার মুখের দিকে তাকিয়ে খুল্লদর্দ্দরও সব হাসিমুখে মেনে নিতো। কোন প্রতিবাদ করতো না।

কিন্তু উগ্র প্রকৃতির খুল্লদর্দ্দর এই সব নীচ জাতীয় বালকের কাছ থেকে অপমানিত হয়ে শেষে খেপে উঠলো একদিন। আর সহ্য করতে পারলো না। শত হলেও সে রাজপুত্র। দাদাকে সে বললো, "দাদা, রোজ রোজ এই ছোটলোকগুলো আমাদের নির্যাতন করে। আমরা যে বিষধর এই বোকা ছাগলগুলো তা জানে না। আমি এবারে এক একটাকে বিষের ছোবল মারবো। 'ব্যাঙ-

খেকো,' "পাঁক-খেকো' বলে গাল দেওয়া চিরদিনের মত ঘুচিয়ে দেবো আমি।"

ছোট ভাইয়ের কথা শুনে বোধিসত্ত্ব বললো, "নিজের দেশ ছেড়ে যারা বিদেশে আশ্রয় নেয়, তাদের অনেক অপমান সহ্য করতে হয়। যারা বিদ্বান বুদ্ধিমান তারা দূরদেশে গেলে ছোট জাত—চাকর-বাকরদের তর্জ্জন গর্জন ও সহ্য করতে হয়। রাগ করে হিংসা করা তার সাজেনা—কারণ তাতে করে বিপদকেই ডেকে আনা হয় শুধু। কষ্ট করে সব অবস্থাকে মানিয়ে নাও ছোটভাই।"

নাগরাজপুত্রেরা সমস্ত মান অপমান সহ্য করে তিন বছর কাটিয়ে দিলো। নির্বাসন দণ্ড শেষে তাঁদের বাবা সাদরে রাজপুত্রদের রাজধানীতে ফিরিয়ে নিয়ে গেলেন।

২৫ [] শীলমীমাংস-জাতক []

পুরাকালে বারাণসীর রাজা ছিলেন ব্রহ্মদত্ত। বোধিসত্ত্ব তখন ব্রাহ্মণের ঘরে জন্মেছিলেন। বড় হয়েই বিদ্যাশিক্ষার জন্য রাজ্যের সুবিখ্যাত আচার্য্যের কাছে গেলেন তিনি। কঠিন সাধনায় আর পরিশ্রমে তিনি আচার্য্যের পাঁচশো শিষ্যের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ আসন লাভ করলেন।

এদিকে আচার্য্য ব্রাহ্মণের এক মেয়ে ছিলো। তার বিয়ের বয়স হলো। তখন আচার্য্য বিবেচনা করলেন, "আমার সমস্ত শিষ্যদের মধ্যে যে সর্বাপেক্ষা চরিত্রবান—তার সংগেই আমি আমার মেয়ের বিয়ে দেবো। এখন ছাত্রদের পরীক্ষা নিতে হবে।" এই ভেবে একদিন আচার্য্য তাঁর সব শিষ্যদের ডেকে বল্লেন, "দেখো, আমার মেয়ের বিয়ে দেওয়ার সময় হয়েছে। তোমরা জানো

যে বস্ত্রালঙ্কার ছাড়া বিয়ে হয় না। তোমরা সবাই এমনভাবে কৌশলে বস্ত্রালঙ্কার অপহরণ করে আনবে, যাতে করে তোমাদের আত্মীয় স্বজন বা বন্ধুরা কিছুতেই জানতে না পারে। সবার অগোচরে আনা না হলে আমি তা কিছুতেই গ্রহণ করতে পারবো না।"

শিষ্যরা সবাই বস্ত্র ও অলঙ্কার সংগ্রহ করতে বেরিয়ে পড়লো। সবাই গেলো। কিন্তু বোধিসত্ত্ব গেলেন না কোথায়ও বা কিছু সংগ্রহ করেও এনে দিলেন না। অন্যান্য শিষ্যরা সবাই জিনিষপত্র এনে দিলো গুরুদেবকে।

বোধিসত্ত্ব কিছু দিলেন না দেখে আচার্য্য বিস্মিত হয়ে জিগ্যেস করলেন, "কি ব্যাপার বৎস, তুমি দেখছি কিছুই আনতে পারলে না এখনও। সবাই নিয়ে এলো—।"

"না, গুরুদেব। আমি আনতে পারি নি কিছুই।"

"কেন আনতে পারোনি বৎস? কি অসুবিধে তোমার?"

"আপনি বলেছেন, যা কিছু আনবো গোপনে আনতে হবে আর কেউ জানতে পারবে না। কিন্তু অপহরণ করার মত পাপ কাজে কোন কিছুই গোপন থাকতে পারবে না। পাপের সাক্ষী থাকেই। অলক্ষ্যে বনদেবতারা দেখেন। আর প্রাণীশূন্য স্থানতো পৃথিবীতে কোথায়ও নেই। আমি তাই কিছু আনিনি আচার্য্য।" বোধিসত্ত্বের উত্তর শুনে খুবই খুশী হলেন তিনি।

আচার্য্য গরীব ছিলেন না মোটেই। তিনি বুঝতে পারলেন, বোধিসত্ত্ব ছাত্রদের ভেতর সবচেয়ে বিদ্বান-বুদ্ধিমানই শুধু নন তিনি পরম চরিত্রবান। তিনি তাই বোধিসত্ত্বের সংগে তাঁর একমাত্র কন্যার বিয়ে দিলেন। আর অন্যান্য শিষ্যরা যে যা জিনিষপত্র এনেছিলো, তাদের তা ফিরিয়ে নিয়ে যেতে বল্লেন তিনি।

২৬ [] সুজাতা-জাতক []

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের আমলে বোধিসত্ত্ব ছিলেন রাজার ধর্মানুশাসক অমাত্য। একদিনের ঘটনা। রাজা রাজ-প্রাসাদের জানালা খুলে বাইরের রাস্তাতে একটি ফেরিওয়ালা মেয়েকে দেখতে পেলেন। মেয়েটি ঝুড়ি মাথায় নিয়ে "চাই কুল—কুল চাই মিষ্টি কুল" বলতে বলতে রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলো। রাজা মেয়েটির সুন্দর গলার আওয়াজ আর রূপলাবণ্য দেখে মুগ্ধ হলেন। খোঁজ নিয়ে জানলেন মেয়েটি কুমারী আর তার নাম হল সুজাতা।

রাজা তখন মেয়েটিকে বিয়ে করে অগ্রমহিষীর পদে বরণ করলেন।

একদিন রাজা সোনার থালায় করে কুল খাচ্ছিলেন। সুজাতা দেবী মহারাজকে কুল খেতে দেখে জিগ্যেস করলেন, "মহারাজ গোল গোল দেখতে এগুলো কী ফল খাচ্ছেন আপনি? লাল লাল কী সুন্দরই না দেখাচ্ছে এগুলো সোনার পাত্রে?" রাজা এ কথা শুনে মনে মনে প্রচণ্ড রেগে গেলেন। "কি স্পর্ধা! পাকা কুল ঝুড়ি মাথায় করে রোদ-ঝড়-জলে বিক্রি করা যার চৌদ্দ পুরুষের ব্যবসা—সে কিনা আজ কুল চিনতে পারছে না!"

রাজা তখন চীৎকার করে সুজাতাকে বল্লেন, "ন্যাকড়া পরে, ন্যাড়া মাথায় কাখে হাত রেখে সারাজীবন যা কুড়িয়ে বেড়াতি, যা বেচে তোর বাপ দু মুঠো ভাত জোগাড় করতো, আর এখন রাজ-বাড়ির ঘি-ভাত খেয়ে সব ভুলে গেলি? রাণী হয়ে খুব গরম মেজাজ হয়েছে। তাই সুখ কপালে সইলো না। এখন থেকে এক কাপড়ে রাজপ্রাসাদ থেকে বেরিয়ে গিয়ে কুল কুড়িয়েই ভাত খেতে হবে

তোকে।" রাজা রাগে উন্মত্ত হয়ে গেলেন। তখন বোধিসত্ত্ব রাজাকে শান্ত করলেন এই বলে যে, "নারীদের নিয়মই এই। উঁচু অবস্থাতে এলেই পুরোনো রিক্ততার দিন ভুলে যায়। এতে রমণীর কোন দোষ হয় না।"

রাজা তখন বোধিসত্ত্বের কথা শুনে সুজাতার অপরাধ ক্ষমা করে দিলেন।

২৭ [] পলাশ-জাতক []

প্রাচীনকালে বারাণসীর রাজা ছিলেন ব্রহ্মদত্ত।

বোধিসত্ত্ব তখন বারাণসীর কাছে এক পলাশবৃক্ষদেবতা রূপে জন্মেছিলেন। সে সময় বারাণসীর সমস্ত লোক বৃক্ষদেবতার বড় ভক্ত ছিলো। তারা তাদের দুঃখ দুর্দশা লাঘবের জন্য মানত করে নানা প্রকার পূজো দিত।

এদিকে এক গরীব দুর্গত ব্রাহ্মণ ভাবলেন, "আমিও এবার থেকে কোন এক বৃক্ষ দেবতার সেবা করবো। এই উদ্দেশ্যে তিনি উঁচু জমিতে নির্জনে একাকী দাঁড়িয়ে পলাশ গাছটিকে বেছে নিলেন পূজার উদ্দেশ্যে। গাছের গোড়ার চারপাশের ঘাস আর আগাছা পরিষ্কার করলেন। সেখানে জল ছড়িয়ে, ঝাঁট দিয়ে, গোবর জল ছড়িয়ে শুদ্ধ করে নিলেন গাছটিকে নানারকম গন্ধ দ্রব্য দিয়ে সাজালেন। মালা আর গন্ধ ধূপের আরতিতে গাছটির পূজো করলেন। প্রদীপ জ্বালিয়ে দিলেন গাছের গোড়াতে। "এবারে সুখে ঘুমিয়ে পড়ো ঠাকুর" বলে ব্রাহ্মণ বৃক্ষটিকে প্রদক্ষিণ করে চলে গেলেন।

পরদিন খুব ভোরে এসে প্রথমেই ব্রাহ্মণ বৃক্ষটিকে জিগ্যেস করলো, "কাল রাতে ভালো ঘুম হয়েছিলো তো?"

এমনিভাবে বেশ কিছুদিন কেটে গেলো। বৃক্ষদেবতা ভাবলেন, "এই ব্রাহ্মণ আমাকে এত সেবা যত্ন করছে, আমি কি এর ভক্তির পরীক্ষা নেবো। আর যে উদ্দেশ্যে আমার পূজো করছে তা পূরণ করবো।"

একদিন ব্রাহ্মণ যখন ভক্তিভরে বৃক্ষদেবতাকে পূজো করছিলো, এমন সময় বৃক্ষদেবতা স্বয়ং এক বুড়ো বামুনের বেশে ব্রাহ্মণের সামনে এসে দাঁড়ালো। "তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? না হলে চোখে দেখে না, কানে শোনে না, কথা বলে না এমন এক গাছকে কেউ এত সেবা যত্ন করে, না পূজো করে কখনও? আমি তো বাপের জন্মে এমন কাণ্ড কোথায়ও দেখিনি—এর কাছে কোন বর পাবে তুমি আশা করো?"

'উন্নত কাণ্ডের এই বৃক্ষই আমার আরাধ্য দেবতা। আমি অন্য আর কিছু জানিনা। আমি ঠিক জানি দেবতা একদিন ভক্তের মনস্কামনা পূর্ণ করবেন—আমি তাই দেবতার সেবাযত্ন করে চলেছি।' ব্রাহ্মণের উত্তর শুনে বৃক্ষদেবতা প্রসন্ন হলেন খুব। বল্লেন, "ব্রাহ্মণ, তোমার ভয় নেই। আমি জন্মান্তর লাভ করেছি বৃক্ষদেবতা হয়ে। আমি তোমাকে প্রচুর ধন দেবো।"

বৃক্ষদেবতার নির্দেশে ব্রাহ্মণ মাটির নীচের সাত রাজার ধন, গুপ্তধন পেলো। ব্রাহ্মণের দারিদ্র্য সারা জীবনের মত পালিয়ে গেলো। ধনী লোকের মত আরাম আয়েশ করে জীবন কাটাতে লাগলো সেই ব্রাহ্মণ।

২৮ [] শবক-জাতক []

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব চণ্ডালের ঘরে জন্মেছিলেন। বড় হয়ে তিনি শ্মশানে চণ্ডালের কাজই করতেন। একদিন বোধিসত্ত্বের স্ত্রীর খুব আম খেতে ইচ্ছে হলো। অথচ তখন আমের সময় নয়। অথচ অন্য কোন ফল বোধিসত্ত্বের স্ত্রী কিছুতেই খেতে চাইলো না। এও জানালো সে, আম না পেলে সে বাঁচবে না আর। বোধিসত্ত্ব স্ত্রীকে খুব ভালবাসতেন। তিনি তাই আমের সন্ধানে বেরুলেন।

কিন্তু কোথায় অকালে আম পাওয়া যাবে? তখন বারাণসীরাজের উদ্যানে একটা বারোমেসে আমগাছ ছিলো। বোধিসত্ত্ব ঠিক করলেন ঐ গাছ থেকেই রাতেরবেলা একটা পাকা আম স্ত্রীর জন্য চুরি করে আনবেন।

রাত্রিবেলা বোধিসত্ত্ব আমের খোঁজে গাছের ডালে ডালে খোঁজাখুঁজি শুরু করলেন। কিন্তু খুঁজতে খুঁজতে ভোর হয়ে গেলো। তখন বোধিসত্ত্ব যদি বাইরে বেরিয়ে আসেন তবে আম-চোর হিসাবে ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা। তার চেয়ে বরং সন্ধ্যা নামলেই যাওয়া ভালো। একথা ঠিক করে তিনি গাছের ডালে ঘন পাতার আড়ালে সন্তর্পণে লুকিয়ে রাখলেন নিজেকে।

ঠিক ঐ সময়ে বারাণসীরাজ তাঁর পুরোহিতের কাছে মন্ত্র শিখছিলেন। রাজা সেদিন বাগানে ঢুকেই আম গাছের নীচে উঁচু আসনে বসলেন। পুরোহিতকে নীচু আসনে বসালেন। এভাবে মন্ত্র উচ্চারণ পর্ব শুরু হলো।

বোধিসত্ত্ব মনে মনে ভাবলেন, রাজা "খুবই অধার্মিক। কেননা

ইনি উচ্চাসনে বসেই মন্ত্র শিখছিলেন। আর এই পুরোহিতও অধার্মিক। কেননা উনি নিজে উচ্চাসনে না বসেই মন্ত্র আওড়াচ্ছেন। আমিও অধার্মিক। কেননা স্ত্রীর বশীভূত হয়ে আমি নিজের প্রাণ তুচ্ছ করে আম চুরি করতে প্রবৃত্ত হলাম। ধিক্‌ আমাকে!" একথা বলেই বোধিসত্ত্ব গাছের ডালের মাঝখান থেকে লাফ দিলেন। পড়লেন দু'জনের মাঝখানে। বললেন, "মহারাজ আমি তো মরেই গেছি। কিন্তু আপনার মোটা বুদ্ধি। আর এই পুরোহিত শুধু মূর্খই নয় জীবিত থেকেও মৃত।

বোধিসত্ত্বের এ কথা শোনার পর রাজা জিজ্ঞেস করলেন, "কে তুমি! এখানে কি করছ?"

"মহারাজ আমি এক অধম চণ্ডাল। আমি আম চুরি করতে এসেছি—বৌকে খুশী করতে। এসে দেখলাম আর এক অধর্ম ঘটতে। গুরু নীচে বসে আর শিষ্য তার মাথার উপরে বসে মন্ত্র পাঠ করছে। আপনারাও ধর্মচ্যুত। আমিও ধর্মচ্যুত। অধর্ম থেকে আমাদের কারুরই নিস্তার নেই কখনও।

বোধিসত্ত্বের কথাতে রাজা বড়ই সন্তুষ্ট হলেন। "ওহে বাপু, তুমি বড় সুন্দর ধর্মকথা বললে। তুমি যদি চণ্ডাল না হতে তোমাকে আমার এ রাজ্য দান করতাম। যাই হোক, এখন থেকে আমি দিনে রাজা আর তুমি রাতে রাজা থাকবে।" একথা বলে নিজের গলার পুষ্পদাম খুলে বোধিসত্ত্ব চণ্ডালের গলায় পরিয়ে দিলেন। রাজা বোধিসত্ত্বকে রাজ্যের নগরপাল নিযুক্ত করলেন। এরপর থেকে রাজা নিয়মিত বোধিসত্ত্বের কাছ থেকে ধর্মোপদেশ শুনতে লাগলেন।

২৯ [] ক্ষান্তিবাদি-জাতক []

পুরাকালে বারাণসীতে কলাবু নামে এক রাজা ছিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণের ঘরে কুণ্ডলকুমার নামে জন্মগ্রহণ করলেন। তিনি ছিলেন সর্ববিদ্যায় পারদর্শী। অলৌকিক বিভবসম্পন্ন। তখন তক্ষশীলায় বোধিসত্ত্বের চেয়ে জ্ঞানী কেউ ছিলোনা।

বোধিসত্ত্বের বাবা প্রচুর ধনসম্পদ রেখে মারা গেলেন। তখন বোধিসত্ত্ব দানের যোগ্য লোক বেছে নিয়ে সমস্ত টাকাপয়সা নিঃশেষে দান করলেন। এমনি করে পুর্বপূরুষের সমস্ত সঞ্চিত ধন বিলিয়ে দিয়ে তিনি হিমবন্ত প্রদেশে চলে গেলেন। সেখানে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। বনের ফলমূল খেয়ে ঝর্ণার জলে তৃষ্ণা নিবারণ করে সাধনা করতে লাগলেন।

হিমবন্তে দীর্ঘদিন কাটিয়ে একদিন বোধিসত্ত্ব লোকালয়ে নেমে এলেন লবণ ও অম্ল নেবার জন্য। তখন বারাণসীতে গিয়ে তিনি রাজোদ্যানে প্রবেশ করলেন। সেখানে রাত কাটিয়ে তিনি ভিক্ষে করার জন্য নগরে প্রবেশ করলেন। সেনাপতির গৃহে ভিক্ষে করার সময় স্বয়ং সেনাপতি তাঁর ব্যবহার আর পণ্ডিত্যপূর্ণ কথাবার্তা শুনে খুশী হয়ে সাদরে বাড়ির ভিতর নিয়ে গেলেন তাঁকে। নিজের জন্য যেসব সুস্বাদু খাবারদাবার রান্না হয়েছিলো তাঁকে যত্ন করে খাওয়ালেন। কিছুতেই বোধিসত্ত্বকে নগরের বাইরে যেতে দিতে রাজী হলেন না সেনাপতি। বাধ্য হয়ে সেনাপতির অনুরোধে বোধিসত্ত্ব রাজী হলেন রাজোদ্যানে পাতার কুটিরে থাকতে।

একদিন রাজা কলাবু সুরাপানে মত্ত হয়ে নটদের নিয়ে মহা আড়ম্বরে রাজোদ্যানে এলেন। সেখানে নাচগানের আসর বসলো।

নৃত্যগীতবাদ্যনিপুণা নর্তকীদের গানে তিনি ব্যস্ত হলেন নিজের মনোরঞ্জন করতে। তখন রাজা কলাবুর প্রতাপপ্রভাব আর ঐশ্বর্য্যকে দেবরাজ শক্রুর সমৃদ্ধির সঙ্গে তুলনা করা হতো।

নাচ দেখতে দেখতে আর গান শুনতে শুনতে রাজা কলাবুর নিদ্রা এলো গভীরভাবে। নর্তকীরা রাজা ঘুমিয়ে পড়েছেন দেখে বীণা আর বাদ্যযন্ত্র রেখে বাগানে ঘুরে ঘুরে ফুল তুলে বেড়াতে লাগলো।

এদিকে বোধিসত্ব তখন বিশালকায় এক শাল বৃক্ষের নীচে বসে ধ্যানে মগ্ন ছিলেন ঐশ্বরিক আনন্দে। রাজনর্তকীরা বোধিসত্ত্বকে দেখে পরম শ্রদ্ধায় আভূমিনত হয়ে প্রণাম করলো তাঁকে। বোধিসত্ত্বের ধ্যান ভাঙ্গলো। তিনি রমনীদের অনুরোধে ধর্মকথা শোনাতে লাগলেন।

এদিকে রাজার ঘুম ভাঙ্গলো। উঠে দেখলেন নর্তকী ও অন্যান্য রমনীরা কেউ কোথাও নেই। খোঁজ নিয়ে রাজা কলাবু জানলেন, তাঁর সুন্দরী নর্তকীরা কোন এক সাধুর পায়ের নীচে বসে ধর্মকথা শুনছে। রাজা প্রচণ্ড ক্রুদ্ধ হয়ে ধারালো খড়্গ নিয়ে ছুটলেন ভণ্ড তপস্বীকে শাস্তি দিতে।

রাজাকে আসতে দেখে নর্তকীরা ছুটে গেলো রাজার কাছে। মিষ্টি কথায় রাজার রাগ কমালো তারা। রাজা বোধিসত্ত্বকে জিগ্যেস করলেন, "শ্রমণ, তুমি কোন মত অবলম্বন করো?" বোধিসত্ত্ব বল্লেন, "মহারাজ আমি ক্ষান্তিবাদী।"

"ক্ষান্তি আবার কি?"

"লোকে গোলমাল করলে, মারধর করলে, শত গ্লানিতেও মনের যে শান্ত অক্রুদ্ধভাব, তাকেই বলে ক্ষান্তি।"

"তাই নাকি? আচ্ছা এখনই দেখছি, তুমি কতটা ক্ষান্তিবাদী।"

রাজার হুকুমে জল্লাদ এলো। হাতে চাবুক আর খড়্গ নিয়ে। "এই ভণ্ড সাধুকে দু'হাজার বার চাবুক মারো। সারা শরীর যেন ফেটে ফেটে যায়। দেখবো কেমন ক্ষান্তি।"

ঘাতক ক্লান্ত হয়ে থামলো চাবুক মেরে মেরে। বোধিসত্ত্বের সারাশরীরে রক্ত আর মাংসে মাখামাখি হলো।

"কি সাধু? এখন তুমি কোন বাদী বলতো?"

"আমি ক্ষান্তিবাদী। তবে আপনি ভুল ভেবেছেন—আমার চামড়ার নীচে ক্ষান্তি নেই। রয়েছে হৃদয়ের গভীরে। তা দেখার মত চোখ আপনার নেই মহারাজ।"

"ঘাতক। এক্ষুণি এ ভণ্ড সাধুর হাত-পা কেটে ফেল।"

ঘাতক তাই করলো। রক্তের ঝর্ণা বয়ে গেলো বোধিসত্ত্বের সর্বশরীরে।

"বল সাধু, এখন তুমি কোন বাদী?

"মহারাজ আমি ক্ষান্তিবাদী। হাত-পায়ে ক্ষান্তি নেই। হৃদয়ের গভীরে তা থাকে মহারাজ।" বোধিসত্ত্বের কথা শুনে রাজা জল্লাদকে আদেশ দিলেন তাঁর নাক আর কান কেটে ফেলতে। জল্লাদ তক্ষুনি সেই আদেশ পালন করলো।

রক্তের নদীতে শুয়ে রইলেন বোধিসত্ত্ব।

রাজা আবার জিগ্যেস করলেন, "এখন তুমি কোন বাদী?"

"মহারাজ, আমি ক্ষান্তিবাদী। নাক আর কানে ক্ষান্তি থাকে না—আপনি ভুল করছেন। ক্ষান্তি থাকে হৃদয়ের গভীরতম কোণে।"

"তবে রে ভণ্ড সাধু। তুই শুয়ে থাক ক্ষান্তির স্পর্ধা নিয়ে।"—এই বলে রাজা বোধিসত্ত্বের বুকে বার বার ঘৃণা সহকারে পদাঘাত করে রাজপ্রাসাদে ফিরে গেলেন।

রাজা চলে গেলে সেনাপতি গভীর মমতায় বোধিসত্ত্বের শরীরের রক্ত মুছে দিলেন। হাত-পা, নাক, কানের ক্ষতে পট্টি বেঁধে দিলেন। তারপর বোধিসত্ত্বের চরণে মাথা রেখে করজোড়ে মিনতি করলো সেনাপতি, "প্রভু, আপনার প্রতি যে অত্যাচার হলো তার জন্য রাজার উপর ছাড়া আপনি যেন আর কারুর ওপরে ক্রুদ্ধ হবেন না দয়া করে।"

"হাত, পা, নাক, কান কেটে চাবুক মেরে ক্ষতবিক্ষত করলো যে রাজা সেই নৃপতি চিরজীবী হোক।" বোধিসত্ত্ব উচ্চারণ করলেন!

এদিকে রাজা উদ্যান থেকে বেরিয়ে যে মুহূর্তে বোধিসত্ত্বের চোখের সামনে থেকে সরে গেলেন—ঠিক তখনই ভূমিকম্পে মাটি ফেটে গেলো। ভূগর্ভ থেকে লেলিহান অগ্নিশিখা বেরিয়ে কম্বলের মতই রাজার গায়ে জড়িয়ে রইলো।

বোধিসত্ত্বও সেদিনই প্রাণত্যাগ করলেন।

১৮ [] দর্দ্দভ জাতক []

পুরাকালে বারাণসীর রাজা ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব সিংহ হয়ে জন্মেছিলেন। তখন পশ্চিম সমুদ্রের তীরে অনেক বেলগাছ ও তালগাছের ঘন বন ছিলো।

একটা বেলগাছের গোড়ায় একটা তালের চারা গজিয়েছিলো। একটা খরগোস তালগাছের চারার নীচে থাকতো। একদিন সে খাদ্যের অন্বেষণে চতুর্দিক ঘুরে এসে ক্লান্ত দেহে তালপাতার নীচে শুয়ে পড়লো। শুয়ে শুয়ে হঠাৎই সে ভাবতে লাগলো, "এই সুন্দর পৃথিবীটা যদি ধ্বংস হয়ে যায় তবে থাকবো কোথায়?"

এদিকে একটা বেল তালপাতার উপর পড়লো। তাতে যে শব্দ হলো সেই শব্দ শুনে খরগোস ভাবলো, "তাইতো, নিশ্চয় পৃথিবী ধ্বংস হতে শুরু হয়েছে। এ তারই শব্দ।"

"চাচা আপন প্রাণ বাঁচা'—এই নীতি মেনে খরগোস এক লাফে সামনের দিকে ছুটতে শুরু করলো। একবারও পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখলো না খরগোসকে মরণ ভয়ে পালাতে দেখে আর একটি খরগোস জিগ্যেস করলো, "কি ব্যাপার ভাই তুমি এত

ভয় পেয়ে পালাচ্ছো কেন? "সে আর বলার কথা নয় ভাই—" বলতে বলতেই ছুটতে লাগলো খরগোস। পেছনের জিগ্যেসকারী খরগোসও "কি হয়েছে ভাই—কি হয়েছে ভাই" বলতে বলতে দ্বিতীয় খরগোসের পেছন পেছন ছুটলো।

প্রথম খরগোস তার ছোটার বেগ কমিয়ে এনে কোন রকমে বললো," ভাই পৃথিবী ধ্বংস হতে শুরু হয়েছে।"

একথা শুনে দ্বিতীয় খরগোসও তার পেছনে পেছনে ছুটতে লাগলো। এরপরে আর একটা খরগোসও তাকে দেখে দৌড়াতে লাগলো। এমনিভাবে শতশত খরগোস দৌড়াতে থাকলো কোন-দিকে না তাকিয়ে। কোন বাধা না মেনে না ভেবে।

এভাবে হরিণ, শূয়র, গোকর্ণ, মহিস, ঘোড়া, গণ্ডার, বাঘ, সিংহ হাতীও পৃথিবী ধ্বংস হচ্ছে শুনে দৌড়াতে শুরু করলো। এমনিকরে এক সময় বনের প্রায় সমস্ত পশুপাখি বন ছেড়ে পালাতে শুরু করলো।

বোধিসত্ত্ব এই সম্মিলিত পশুবাহিনীকে উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়াতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করে জানলেন যে পৃথিবী নাকি ধ্বংস হচ্ছে। বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, "পৃথিবীতো ধ্বংস হতে পারে না। এরা কোন শব্দ শুনে ভয় পেয়ে উল্টোপাল্টা ভেবেছে। আমাকে চেষ্টা করতে হবে সঠিক কারণ খোঁজার, না হলে এদের জীবন বাঁচানো যাবেনা কিছুতেই।"

বোধিসত্ত্ব তখন সিংহনাদ কবতে করতে প্রচণ্ড বেগে ধেয়ে গেলেন পশুবাহিনীর দিকে। পথ আটকে দাঁড়ালেন, "থামো তোমরা পালাচ্ছো কেন? পৃথিবী ধ্বংস হচ্ছে বলে? কে দেখেছে পৃথিবী ধ্বংস হচ্ছে?"

"হাতীরা বলতে পারে।" হাতীদের জিগ্যেস করলেন বোধিসত্ত্ব। হাতীরা বললো তারা জানেনা, সিংহরা জানে। সিংহরা বললো, তারা জানে না তবে বাঘেরা জানে। বাঘেরা বললো, আমরা

জানিনা, গণ্ডারেরা জানে। গণ্ডারেরা বললো, আমরা জানিনা, মহিষেরা জানে। মহিষেরা বললো, আমরা জানিনা, শূয়রেরা জানে। শূয়রেরা বললো, আমরা জানিনা—তবে হরিনেরা জানে! হরিণেরা বললো, আমরা জানিনা তবে খরগোসেরা জানে। বোধিসত্ত্ব তখন খরগোসদের জিগ্যেস করলেন, ব্যাপারটা কী খুলে বলতো?" অন্যান্য খরগোসেরা তখন সবাই সমস্বরে চেঁচিয়ে প্রথম খরগোসকে দেখিয়ে দিলো। বোধিসত্ত্ব তখন প্রথম খরগোসকে কাছে ডাকলেন। "ভাই খরগোস, প্রথম থেকে যা যা ঘটেছে আমাকে বলতো। সত্যিই কি পৃথিবী ধ্বংস হচ্ছে?" 'হ্যাঁ, প্রভু। আমি নিজের চোখে দেখেছি।" খরগোস ভীত চোখে বললো। "কখন দেখলে? কোথায় দেখলে? তখন তুমি কি করছিলে?"

"প্রভু, সমুদ্রতীরে বেল ও তালগাছের যে ঘন বন আছে, আমি সেখানে একটা বেলগাছের গোড়ায়—একটা তালগাছের চারার নীচে শুয়ে একটু চিন্তাভাবনা করছিলাম। হঠাৎ মনে প্রশ্ন হলো, পৃথিবী যদি ধ্বংস হয় তবে কোথায় যাবো? থাকবো কোথায়? খাবো কি? ঠিক তখনই এক ভয়ংকর পৃথিবী ধ্বংসের কানে তালা লাগানো শব্দ শুনে আমি পালাতে লাগলাম।"

বোধিসত্ত্ব ভাবলেন, "এই মূর্খ খরগোস নিশ্চয় তালপাতার ওপরে পাকা বেল পড়ার "ধুপ" শব্দ শুনেছিলো। আর সেই শব্দ শুনেই পৃথিবী ধ্বংস হচ্ছে এই ভেবে নিয়ে পালাতে শুরু করেছিলো। আমি এর আসল কারণটা খুঁজে বের করবোই।" বোধিসত্ত্ব পশুদের বল্লেন, "তোমরা সবাই এখানেই অপেক্ষা করো। আমি যতক্ষণ না ফিরি, কেউ এখান থেকে নড়বে না।" এরপর বোধিসত্ত্ব খরগোসকে পিঠে চড়িয়ে প্রচণ্ড বেগে সেই তালবনে এসে পৌঁছালেন। খরগোসকে পিঠ থেকে নামিয়ে বললেন, "এবার আমাকে দেখাও তো—ঠিক কোন জায়গাতে তুমি পৃথিবী ধ্বংস হতে দেখেছিলে?"

কিন্তু ভীত খরগোস কিছুতেই তালগাছের গোড়াতে যেতে রাজী হলোনা। দূর থেকেই দেখালো সব। বোধিসত্ত্বের শত অনুরোধেও সে কাছে যেতে ভয় পাচ্ছিলো দেখে তিনি নিজেই গেলেন। বুঝলেন, বেলগাছ থেকে পাকা বেল পড়েছিলো তালপাতার ওপরে। আর সেটাই যত বিপত্তির মূল কারণ।

বোধিসত্ত্ব তখন খরগোসকে নিয়ে হ্রদের ধারে অপেক্ষমান জীবজন্তুদের কাছে ফিরে গেলেন। বুঝিয়ে বললেন সবকিছু। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সেই প্রথম খরগোস ছাড়া বাকী সব জীবজন্তু প্রাণপণে বিকট আওয়াজে হেসে উঠলো। প্রথম খরগোস লজ্জায় মাথা হেঁট করে রইলো। নিজের বোকামীতে নিজেই মরে যেতে চাইলো সে মুহূর্তে।

সেদিন যদি বোধিসত্ত্ব না থাকতেন, তবে ওই সমস্ত জীবজন্তু দৌড়াতে দৌড়াতে সমুদ্রে পড়ে গিয়ে বিনষ্ট হতো। বোধিসত্ত্বের জন্য সেদিন তাদের প্রাণ বাঁচলো। কখনও গুজবে বিশ্বাস করে নিজের বিপদ ডেকে আনতে নেই।

৩১ [] মাংস জাতক []

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক শ্রেষ্ঠীপুত্র হয়ে জন্মেছিলেন। প্রচুর অর্থের উত্তরাধিকার ছিলো তাঁর।

একদিন সকালবেলা। বারাণসী নগরের বাইরে যেখানে অনেকগুলো রাস্তা বিভিন্ন দিক থেকে এসে মিশেছিলো—সেই পাঁচরাস্তার মোড়ে, এক দোকানে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছিলো—অনেক যুবক। সেই ফুল আর সরবতের দোকানে আড্ডা তখন জমজমাট। দোকানে বারাণসীর চারজন শ্রেষ্ঠীপুত্র নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সমানে আড্ডা আর তর্ক করছিলো।

এমন সময় এক ব্যাধ একটি ঠেলা গাড়িতে করে প্রচুর ভেড়া, মোষ, হরিণ আর খাসীর মাংস নিয়ে বিক্রি করতে করতে যাচ্ছিলো। চার যুবক বন্ধু নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলো,—ওই ব্যাধের কাছ থেকে মাংস আদায় করে আনা যাক। কে যাবে প্রথমে ?"

তখন প্রথম শ্রেষ্ঠীপুত্র বাহাদুরি করে এগিয়ে গেলো ব্যাধের মাংস বোঝাই গাড়ির দিকে। "এই ব্যাটা নোংরা বদমাস—মাংস নিয়ে যাচ্ছিস চোখের সামনে দিয়ে সাহসতো কম নয় তোর! দে, মাংস দে দেখি কিছু—।" ব্যাধ বললো, "ভদ্রভাবে কথা বলো। অন্যের নিকট কিছু চাইতে হলে একটু মোলায়েম গলায় কথা বলতে হয়। এক টুকরো মাংসও তুমি পাবে না—ভাগো—।" সুবিধে হবে না বুঝে মানে মানে কেটে পড়লো শ্রেষ্ঠীপুত্র।

সব শুনে এর পরে এলো দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠীপুত্র। ব্যাধের কাছে এসে সে মোলায়েম গলায় বললো, "দাদা আমাকে অল্প একটু মাংস দাওনা—।" ব্যাধ বললো, "তোমার ব্যবহারের মতই মাংস দেবো। এই নাও হরিণের মাংস এক টুকরো।" মাংস নিয়ে ফিরলো দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠীপুত্র।

এবারেও সবকথা শোনার পর মাংস আনতে গেলো তৃতীয় শ্রেষ্ঠীপুত্র। "বাবা, আমাকে এক টুকরো মাংস খেতে দেবে? অনেকদিন জমিয়ে মাংস খাইনি।"

ব্যাধ বললো,, "তোমার কথায় উপযুক্ত মাংস পাবে। এই নাও হরিণের হৃৎপিণ্ড।" খুশী মনে ফিরলো যুবক শ্রেষ্ঠীপুত্র।

চতুর্থ শ্রেষ্ঠীপুত্র তৃতীয় বন্ধুর কাছ থেকে সব জেনে নিয়ে ব্যাধের কাছে গেলো মাংস আনতে। ব্যাধকে বললো, "বন্ধু আমাকে এক টুকরো মাংস দাও তো।'

ব্যাধ বললো, তোমার কথা অনুযায়ী মাংস পাবে তুমি।" ব্যাধ চতুর্থ শ্রেষ্ঠীপুত্রকে সমস্ত মাংস দিয়ে দিলো।

বললো, "সুখে দুঃখে যাকে পাওয়া যায় পাশে সেই হলো বন্ধু।

কিন্তু ভীত খরগোস কিছুতেই তালগাছের গোড়াতে যেতে রাজী হলোনা। দূর থেকেই দেখালো সব। বোধিসত্ত্বের শত অনুরোধেও সে কাছে যেতে ভয় পাচ্ছিলো দেখে তিনি নিজেই গেলেন। বুঝলেন, বেলগাছ থেকে পাকা বেল পড়েছিলো তালপাতার ওপরে। আর সেটাই যত বিপত্তির মূল কারণ।

বোধিসত্ত্ব তখন খরগোসকে নিয়ে হ্রদের ধারে অপেক্ষমান জীবজন্তুদের কাছে ফিরে গেলেন। বুঝিয়ে বললেন সবকিছু। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে সেই প্রথম খরগোস ছাড়া বাকী সব জীবজন্তু প্রাণপণে বিকট আওয়াজে হেসে উঠলো। প্রথম খরগোস লজ্জায় মাথা হেঁট করে রইলো। নিজের বোকামীতে নিজেই মরে যেতে চাইলো সে মুহূর্তে।

সেদিন যদি বোধিসত্ত্ব না থাকতেন, তবে ওই সমস্ত জীবজন্তু দৌড়াতে দৌড়াতে সমুদ্রে পড়ে গিয়ে বিনষ্ট হতো। বোধিসত্ত্বের জন্য সেদিন তাদের প্রাণ বাঁচলো। কখনও গুজবে বিশ্বাস করে নিজের বিপদ ডেকে আনতে নেই।

৩১ [] মাংস জাতক []

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব এক শ্রেষ্ঠীপুত্র হয়ে জন্মেছিলেন। প্রচুর অর্থের উত্তরাধিকার ছিলো তাঁর।

একদিন সকালবেলা। বারাণসী নগরের বাইরে যেখানে অনেকগুলো রাস্তা বিভিন্ন দিক থেকে এসে মিশেছিলো—সেই পাঁচরাস্তার মোড়ে, এক দোকানে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছিলো—অনেক যুবক। সেই ফুল আর সরবতের দোকানে আড্ডা তখন জমজমাট। দোকানে বারাণসীর চারজন শ্রেষ্ঠীপুত্র নিজেদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সমানে আড্ডা আর তর্ক করছিলো।

এমন সময় এক ব্যাধ একটি ঠেলা গাড়িতে করে প্রচুর ভেড়া, মোষ, হরিণ আর খাসীর মাংস নিয়ে বিক্রি করতে করতে যাচ্ছিলো। চার যুবক বন্ধু নিজেদের মধ্যে বলাবলি করলো,—ওই ব্যাধের কাছ থেকে মাংস আদায় করে আনা যাক। কে যাবে প্রথমে?"

তখন প্রথম শ্রেষ্ঠীপুত্র বাহাদুরি করে এগিয়ে গেলো ব্যাধের মাংস বোঝাই গাড়ির দিকে। "এই ব্যাটা নোংরা বদমাস—মাংস নিয়ে যাচ্ছিস চোখের সামনে দিয়ে সাহসতো কম নয় তোর! দে, মাংস দে দেখি কিছু—।" ব্যাধ বললো, "ভদ্রভাবে কথা বলো। অন্যের নিকট কিছু চাইতে হলে একটু মোলায়েম গলায় কথা বলতে হয়। এক টুকরো মাংসও তুমি পাবে না—ভাগো—।" সুবিধে হবে না বুঝে মানে মানে কেটে পড়লো শ্রেষ্ঠীপুত্র।

সব শুনে এর পরে এলো দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠীপুত্র। ব্যাধের কাছে এসে সে মোলায়েম গলায় বললো, ''দাদা আমাকে অল্প একটু মাংস দাওনা—।" ব্যাধ বললো, "তোমার ব্যবহারের মতই মাংস দেবো। এই নাও হরিণের মাংস এক টুকরো।" মাংস নিয়ে ফিরলো দ্বিতীয় শ্রেষ্ঠীপুত্র।

এবারেও সবকথা শোনার পর মাংস আনতে গেলো তৃতীয় শ্রেষ্ঠীপুত্র। "বাবা, আমাকে এক টুকরো মাংস খেতে দেবে? অনেকদিন জমিয়ে মাংস খাইনি।"

ব্যাধ বললো,, "তোমার কথায় উপযুক্ত মাংস পাবে। এই নাও হরিণের হৃৎপিণ্ড।" খুশী মনে ফিরলো যুবক শ্রেষ্ঠীপুত্র।

চতুর্থ শ্রেষ্ঠীপুত্র তৃতীয় বন্ধুর কাছ থেকে সব জেনে নিয়ে ব্যাধের কাছে গেলো মাংস আনতে। ব্যাধকে বললো, "বন্ধু আমাকে এক টুকরো মাংস দাও তো।'

ব্যাধ বললো, তোমার কথা অনুযায়ী মাংস পাবে তুমি।" ব্যাধ চতুর্থ শ্রেষ্ঠীপুত্রকে সমস্ত মাংস দিয়ে দিলো।

বললো, ''সুখে দুঃখে যাকে পাওয়া যায় পাশে সেই হলো বন্ধু।

বন্ধু ছাড়া নগরে বসবাস করলেও ঘোর জঙ্গলে আছি বলে মনে হয়। জগতে 'বন্ধু' শব্দের চেয়ে প্রিয় আর কিছু নেই। এসো বন্ধু! আমি এই সমস্ত মাংস নিজে তোমার বাড়িতে পৌঁছে দিয়ে আসবো।"

শ্রেষ্ঠীপুত্র ব্যাধের মহত্ব ও উদারতায় মুগ্ধ হয়ে সসম্মানে ব্যাধকে তার বাড়িতে নিয়ে গেলো। পরে ব্যাধের স্ত্রীপুত্রকেও নগরে এনে নিজের বাড়িতে রাখলো। বন্ধুকে ব্যাধবৃত্তি পরিত্যাগ করাতে বাধ্য করালো। ব্যবসাতে সমান অংশীদার করে নিলো।

তারপর থেকে শ্রেষ্ঠীপুত্র সারাজীবন ধরে সেই ব্যাধের সংগে অভেদ্য বন্ধুত্বের সংগে বাস করতে লাগলো।

সেই চতুর্থ শ্রেষ্ঠীপুত্রই ছিলেন বোধিসত্ত্ব।

৩২ [] বাবেরু জাতক []

রাজ্য বারাণসী। রাজা ব্রহ্মদত্ত। আর বোধিসত্ত্ব জন্মালেন ময়ূর হয়ে। ময়ূর এমনিতেই খুব সুন্দর দেখতে। কিন্তু যৌবন এলে বোধিসত্ত্ব হয়ে উঠলেন অপরূপ সুন্দর আর লাবণ্যময়। আকাশে মেঘ ভাসলে তিনি যখন পেখম মেলে নাচতেন; তখন তা পরম দর্শনীয় হয়ে উঠতো অন্যান্য সকল ময়ূর-ময়ূরীর কাছেও। তিনি ছিলেন বনের সবার প্রিয়পাত্র। এমনিভাবে মেঘ বৃষ্টি রোদ আর গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীতে অন্য সবার সংগে সুখেই কেটে যাচ্ছিলো বোধিসত্ত্বের দিনগুলো।

এ সময়ে কিছু বণিক বাবেরু রাজ্যে বাণিজ্য করতে যাবার সময় নৌকাতে করে একটা দিশাকাক সংগে নিয়ে গেলো নেহাতই হেলাফেলা করে। তখন সারা বাবেরু রাজ্যে কোন পাখি ছিলো না। তাই নৌকার মাস্তুলে বসে থাকা দাঁড় কাককে দেখে বাবেরু

দেশের লোকেরা খুবই অবাক হলো। তারা নিজেরা বলাবলি করতে লাগলো, "দেখো, কী সুন্দর কালো চকচকে পালিশ করা বর্ণ এর। এর গলার কাছে, মুখের চারপাশে কি সুন্দর সাদার কারুকাজ। এর চোখ দুটিতে যেন হীরের কুচি বসানো।" কাকের প্রশংসা করে বণিকদের তারা বললো, "মহাশয়েরা, আপনারা এ পাখিটা আমাদের দিয়ে দিন। আমাদের এখানে তো এরকম পাখি নেই। আপনারা তো স্বদেশে ফিরে গেলেই প্রচুর এরকম পাখি দেখতে পাবেন।"

"বেশ তো, নিয়ে নিন। তবে এ সুন্দর পাখির জন্য উপযুক্ত দাম দিতে হবে কিন্তু আপনাদের।" দাঁও মেরে চুপ করে রইলো বণিকেরা। অনেক দর কষাকষির পর একশো কাহণ দাম নিয়ে বণিকেরা কাকটিকে বেচে দিলো বাবেরুর লোকদের কাছে। মুখে বললো, "জিতে গেলেন মশায় আপনারা! এ পাখি আমাদের দারুণ উপকার করে। কিন্তু আপনারা পুরোনো খদ্দের, চটাতে পারিনা, তাই দিলাম।"

কাকের ভাগ্য খুবই ভালো। বাবেরুবাসীরা কাকটাকে সোনার পিঞ্জরে রাখলো। খেতে দিতে লাগলো নানারকম মাছ, মাংস আর সুমিষ্ট বন্যফলমূল। এমনিকরে কাক পরম যত্নে দিন কাটাচ্ছিলো।

পরের বারে বণিকেরা বাবেরু দেশে ব্যবসা করতে যাওয়ার সময় একটা উৎকৃষ্ট ময়ূর সংগে নিয়ে গেলো। ময়ূরটা ছিলো ভালো তালিম পাওয়া। তুড়ি দিলে কেকা রব করতো। হাততালি দিলে নাচতো। পেখম মেলতো। বোধিসত্ত্বই ছিলেন সে ময়ূর।

বাবেরুবাসীরা ময়ূরটিকে দেখে দারুণ বিস্মিত হলো। এত সুন্দর পাখি জীবনে কখনো দেখেনি বাবেরুবাসীরা। "মহাশয়েরা, এই অতি সুন্দর সুশিক্ষিত পাখিটা আমাদের দিয়ে দিন। আপনাদের দেশেতো এমন অনেক পাখি আছে। কিছুই ক্ষতি হবে না আপনাদের।"

বণিকেরা বললো, "প্রথমবারে একটা কাক এনেছিলাম। নিয়ে নিলেন। এবারে ময়ূর আনলাম। এটাও নিয়ে নিতে চাইছেন। দেখছি, আপনাদের এখানে আর কোন পাখি নিয়ে আসা যাবেনা কখনও।"

তারপর দরাদরি হতে হতে এক হাজার কাহণ দিয়ে বনিকদের কাছ থেকে বাবেরুর লোকেরা ময়ূরটি কিনলো অবশেষে। মনিমানিক্যখচিত বিরাট এক সোনার খাঁচায় রাখা হলো তাকে। মাছ, মাংস, ডিম, মধু, ফলমূল, ভাতের মণ্ড আর সুগন্ধী ঠাণ্ডা জল খেতে দেওয়া হলো তাকে।

সবদিক থেকে এখন সমানে ময়ূরেরই আদর যত্ন চলতে থাকলো। কাকের কথা সবাই ভুলে গেলো। কেউ আর খোঁজ নেয়না তার। অসাবধানে খাঁচার দরজাও খুলে গেলো একদিন। ভালোই হলো তাতে ক্ষুধার্ত কাকের। সে অনেকদিন না খেতে পেয়ে মৃতপ্রায় তখন। উপায় না দেখে সে মলপূর্ণ স্থানে গিয়ে বসলো। কিছু না খেলে বাঁচবে না সে আর। বড়লোকের আদর বালির বাঁধের মতই পলকা। ক্ষণস্থায়ী।

৩৩ [] দর্ভপুষ্প-জাতক []

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব নদীতীরে এক বৃক্ষদেবতা হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তখন মায়াবী নামে এক শৃগাল ও তার স্ত্রী নদীর তীরে এক বেতের ঝোপে থাকতো।

একদিন শৃগালী শৃগালকে বললো, "স্বামী, আজ কয়েকদিন ধরে আমার আর কোনকিছু খেতে ভালো লাগছেনা। মুখে রুচি নেই। শুধু ইচ্ছে করছে টাটকা রুইমাছ খেতে—।"

শৃগাল শৃগালীর কথা শুনে বললো, "আরে এতো ভালো কথা।

তোমার কোন চিন্তা নেই। আমি রুইমাছ আনতে যাচ্ছি।" এই বলে শৃগাল নদীতে গেলো। নিজের পাগুলো লতাপাতায় ঢেকে সুকৌশলে নিজের পা দু'টো লুকিয়ে রেখে, নদীর ধারে হাঁটতে লাগলো শিকারের অপেক্ষায়।

ঠিক তখনই গম্ভীরচারী আর অনুতীরচারী নামে দুই উদবেড়াল নদীতীরে মাছ খুঁজে বেড়াচ্ছিলো। এমন সময় জলের মধ্যে একটি বড় রুইমাছ লেজ দিয়ে ঘা মারতেই জলে লাফিয়ে পড়লো গম্ভীরচারী। তীরবেগে ঢুকে পড়লো জলের, তলে, কামড়ে ধরলো মাছের লেজ। মাছটা ছিলো বিরাট দশাসই পালোয়ান গোছের। টেনে ধরে আনা মোটেই সোজা নয়! বরঞ্চ সে উল্টে গম্ভীরচারীকেই টেনে নিয়ে চললো জলের অনেকটা গভীরে। তখন সাহায্যের আশায় চেঁচালো গম্ভীরচারী উদবেড়াল। অনুতীরচারী সংগে সংগে জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো। পৌঁছে গেলো গম্ভীরচারীর কাছে। গম্ভীরচারী বললো, মাছটা খুবই বড়ো—আর গায়েও দারুণ জোর। এতে আমাদের দুজনেরই ভালোভাবে দু'বেলা খাওয়া হয়ে যাবে। চলো দু'জনে মিলে একসঙ্গে একে নদীপাড়ে টেনে নিয়ে যাই।"

এরপর দুই উদবেড়াল মিলে দারুণ মেহনত করে হাঁপাতে হাঁপাতে হোৎকা-মোটা রুইমাছটাকে টেনে তুললো জলের ওপরে। দু'জন মিলে দু'দিক থেকে ধরে আছাড় মেরে খতম করলো রুইমাছটাকে। কিন্তু এর পরেই সমানভাবে মাছের ভাগ করা নিয়ে দুজনে হাতাহাতি শুরু হলো। মাছ পড়ে রইলো অবহেলায়। ততক্ষণে পিঁপড়েরাও জমায়েত হয়েছে মাছের গন্ধে।

ঠিক সে সময় শৃগাল এসে উপস্থিত হলো। এক পলক উদবেড়ালদের দিকে তাকিয়েই ব্যাপারটা বুঝে নিলো খুবই সহজে! আর উদবেড়ালরা শৃগালকে দেখেই ছুটে গেলো। নালিশ করলো দু'জনই দু'জনের নামে। শৃগালকে বললো দয়া করে সে যেন সুবিচার করে। সমানভাবে যেন দুভাগ করে দেয় মাছটাকে।

শৃগাল মহাখুশী। সে বললো, "এতো অতি তুচ্ছ ব্যাপার। কত হাজার হাজার বিচার করলাম এ বয়সে। এমন ভাগ করে দেবো তোমরা দু'জনেই কেউ কোন কথা বলতে পারবেনা।"

এই বলে একজনকে ল্যাজা, আর একজনকে মুড়োটা দিয়ে মাঝখানের পুরো মাছটা নিয়ে কেটে পড়লো সেখান থেকে। দুই উদবেড়াল ফ্যাল্ ফ্যাল্ করে তাকিয়ে রইলো শুধু। কোন কথা বলার সাহস হলোনা।

এম্নি করে দুই উদবেড়ালের কলহের সুযোগ নিয়ে দুষ্ট শৃগাল মায়াবী আর তার স্ত্রী আরাম করে বিনা পরিশ্রমে পাকা রুইমাছ খেতে লাগলো মহা আনন্দে।

অন্যদিকে ঝগড়া বিবাদ করে দুই উদবেড়াল প্রায় আধপেটা খেয়ে পুনরায় হাতাহাতি করতে শুরু করলো। এম্নিভাবে নিজেদের ভেতর মারামারি করতে করতে দু'জনেই মৃত প্রায় হয়ে ঘাড় গুঁজে মরা ইঁদুরের মত মাটিতে পড়ে রইলো।

৩৩ [] ধর্মধ্বজ জাতক []

পুরাকালে বারাণসীতে ব্রহ্মদত্তের সময় বোধিসত্ত্ব পাখি হয়ে জন্মায়। বড় হয়ে তিনি সমুদ্রের ভেতর এক নির্জন দ্বীপে অন্যান্য পাখিদের সংগে একত্রে বাস করতে লাগলেন।

একদিন কাশীরাজ্যের কিছু বাণিজ্য উপলক্ষে দূর দেশে যাচ্ছিলো। কিন্তু হঠাৎ সমুদ্রের মাঝখানে তাদের নৌকা অচল হয়ে পড়ে। অনেক কষ্টে নৌকাটিকে চালিয়ে নিয়ে তারা সেই নির্জন দ্বীপে কোনমতে এসে উপস্থিত হলো। নৌকাটিও গেলো ভেঙ্গে। তখন নৌকো মেরামতের জন্য তারা দ্বীপে দিন কাটানোটাই উপযুক্ত বলে বিবেচনা করলো।

বণিকদের সংগে ছিলো এক দিশাকাক। বণিকেরা তখন কাকের পায়ের শেকল খুলে দিলো। মুক্ত হয়েই কাক দ্বীপটা ভালো করে দেখে বুঝতে পারলো যে দ্বীপে অনেক পাখি থাকলেও কাক নেই কোন। কাক তখনও মনে মনে ঠিক করলো, দ্বীপের পাখিদের সংঙ্গে ভণ্ডামি করে এদের ডিম আর বাচ্চাগুলোকে খেতে হবে।'

সে পাখিদের মধ্যে গিয়ে একপায়ে কায়দা করে দাঁড়ালো— নিজের মুখটাকে যতদূর সম্ভব বাড়িয়ে রাখলো। পাখিরা জিগ্যেস করলো, "তোমাকে এ স্থানে নতুন দেখছি। তুমি কে ভাই?" উত্তরে কাক বললে, "আমার নাম ধার্মিক।"

"এক পায়ে এভাবে কষ্ট করে দাঁড়িয়ে আছো কেন?"

"আমি যদি ছ'পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াই, তবে পৃথিবী সে ভার ধারণ করতে পারবেনা।"

"কিন্তু ঠোঁট ফাঁক করে এভাবে হাঁ করে রয়েছো কেন?"

"আমি অন্য কিছু খাদ্য গ্রহণ করিনা। শুধুমাত্র বাতাস খেয়ে বেঁচে থাকি। অন্য কিছু যে আমার খেতে নেই।"

কাক এই কথা বলেই পাখিদের মোড়লী করে গায়ে পড়ে উপদেশ দিলো, যাতে সবাই ধর্ম পথে চলে, ধর্মের সেবা করে, তবেই সবার পরম কল্যাণ হবে। কখনও ভুল করেও কারুর ক্ষতি করা উচিত নয়। ইত্যাদি······ইত্যাদি।

তখন পাখিরা সবাই কাকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হলো। কাককে পরম ধার্মিক ভেবে নিলো। খুশী হলো এমন ধার্মিক পাখি দেখে। আরও খুশী হলো নিজেদের মধ্যে পেয়ে।

শকুনেরা কাকের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বললো, "প্রভু, আপনিতো অন্য কিছু খান না। কেবল বাতাস খেয়ে থাকেন। আমরা সবাই যখন খাবার খুঁজতে যাবো, তখন অনুগ্রহ করে আমাদের ডিমগুলো, ও শাবকগুলোর দিকে নজর রাখবেন।"

এম্নি করে প্রত্যহ সবাই খাবারের অন্বেষনে গেলে কাক গুটিগুটি

পায়ে শকুন আর অন্যান্য পাখির ডিম ও শাবক খেতে লাগলো পরম সুখে। পাখিদের মধ্যে দারুণ শোরগোল হলেও তারা ঘুণাক্ষরেও ধার্মিক কাককে সন্দেহ করেনি। এমনকি তাকে জিজ্ঞাসা করতেও সঙ্কুচিত হয়েছে। ছিঃ ছিঃ এমন মহাপুরুষকে এসব বলতে আছে।

শেষে একদিন বোধিসত্ত্ব ভাবলেন—দেখতে হবে কার কুকাজ এটা। কাক এখানে আসার পর থেকেই যত ঝামেলা শুরু হয়েছে। আজ সবাই বেরিয়ে গেলে আমি ফিরে এসে দেখবো ব্যাপারটা কী? বাচ্চাদের খুনীকে ধরতেই হবে।" সবাই চরতে বেরিয়ে গেলো। বোধিসত্ত্বও কাকের সামনে দিয়েই গেলেন। ফিরে এলেন একটু পরে। লুকিয়ে রইলেন গাছের আড়ালে। দেখলেন, কাক মহা আনন্দে ডিম আর শাবকগুলোর কাঁচামাংস খাচ্ছে চিবিয়ে।

পাখিরা সবাই ফিরে এলে বোধিসত্ত্ব বললেন, "আমি জানি। কে তোমাদের ডিম আর ছানাপোনা খাচ্ছিলো এতদিন ধরে। আজ আমি নিজের চোখে তাকে খেতে দেখেছি। ধার্মিক সেজে থাকা এই লোভী কাক। এসো আমরা সবাই মিলে ঠুকরে এই জোচ্চোরের মাংস তুলেনি গা থেকে।"

তখন সব পাখি মিলে কাককে আক্রমণ করলো। সব শেষে ছাল-চামড়া ছাড়ানো কাকের ওপর লাফিয়ে পড়ে শকুনেরা কাকের মাথা ছিঁড়ে ফেললো তৎক্ষণাৎ। এম্নিকরে অতি লোভে অকালে প্রাণ হারালো কাক।

৩৪ [] তিরিত্ত—জাতক []

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব ব্রাহ্মণ হয়ে জন্মেছিলেন। বড় হয়ে তিনি তক্ষশিলায় যেয়ে সর্ববিদ্যায় অপরিসীম পাণ্ডিত্য অর্জন করে ফিরে এলেন। কিন্তু সংসার ধর্ম বা বিয়ে না করে হিমবন্ত প্রদেশে যেয়ে সাধু হয়ে গেলেন। সেখানে রমনীয় কাননে ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকতেন তিনি সবসময়।

দীর্ঘকাল এভাবে কেটে গেলো। তিনি একটু লবণ আর অম্ল সেবন করার জন্য প্রত্যন্ত গ্রামে গেলেন! সেখানে লোক তাঁকে দেখে এতো সন্তুষ্ট হলো যে কাছাকাছি অরণ্যে তাঁর জন্য সবাই মিলে এক পাতার কুটির তৈরী করে দিলো। গ্রামের লোকেরাই তাঁর গেরুয়া আলখাল্লা আর সিধে জোগানোর ভার নিলো সানন্দে।

এদিকে ঐ গ্রামে ছিলো এক ব্যাধ। সে একটি শিক্ষিত তিত্তির পাখি ধরে তাকে যত্ন করে শিক্ষা দিয়ে তার সাহায্যে ফাঁদ পেতে বনের অন্যান্য তিত্তির পাখিদের ধরতো। তিত্তির ভাবলো, "আমার মত পাপিষ্ঠ আর কেউ নেই। নিজে তিত্তির হয়ে কিনা তিত্তিরদের ধরিয়ে দিচ্ছি। আমারই জন্য তিত্তিরের বংশ লোপ পাচ্ছে। তিত্তিরের মাংসের আস্বাদ পেয়ে লোভী হয়ে উঠেছে মানুষেরা। আমার রবে মুগ্ধ হয়েই অন্যান্য পাখিরা ফাঁদে ধরা দেয়। মারা যায়। আমি আর কিছুতেই প্রলোভনকারী ডাক দেবোনা।"

কিন্তু তিত্তির শিকারের সময়, তিত্তির ব্যাধের আদেশমত না ডাকাতে, ব্যাধ বাঁশের ছুঁচোলো লাঠি দিয়ে ক্রমাগত এমন আঘাত করতে লাগলো যে, তিত্তিরের মাথা যন্ত্রণায় ছিঁড়ে যাবার মত হলো। বেদনায় কাতর হয়ে বাধ্য হয়ে তিত্তির ডেকে উঠলো।

ব্যাধও পূর্বের মত অন্য তিত্তির ধরে জীবিকা নির্বাহ করতে লাগলো।

একদিন দুপুরবেলা। ব্যাধ সেদিন সেই পোষা তিত্তিরের সাহায্যে বহু তিত্তির ধরে ঝুড়িতে পুরলো। ক্লান্ত হয়ে জলপান করার জন্য এলো বোধিসত্ত্বের আশ্রমে! খাঁচাটা ব্যাধ বোধিসত্ত্বের কাছে রেখে জল খেলো। পরে বালুর ওপরে মাথা রেখে গভীর শ্রান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লো।

ব্যাধকে ঘুমন্ত দেখে বিবেকের কশাঘাতে দংশিত তিত্তির বোধসত্ত্বকে প্রশ্ন করলো, "প্রভু, আমি সুখে আছি। ভালো খাবার-দাবার খাই—যা চাই তা পাই আমার পায়ে রূপোর ঘুঙুর। কিন্তু আমারই কারণে আমার জাত ভাই তিত্তিররা প্রতিদিন মারা যাচ্ছে। এ পাপ আমি কেমন করে খণ্ডাবো প্রভু? যদি এ পাপের প্রায়শ্চিত্তের উপায় বলে দেন—এ অপরাধ আমাকে প্রতি পদে কুরে কুরে খাচ্ছে।"

বোধিসত্ত্ব বললেন, "তোমার মনে তো কোন পাপ ইচ্ছে নেই। তুমি শুদ্ধমতি-উদাসীন হয়ে সবকিছু চোখে দেখছো শুধু। পাপ করে চলেছে ব্যাধ। তোমাকে কখনোই পাপ স্পর্শ করবেনা। তুমি আর দুশ্চিন্তা করোনা এনিয়ে।'

বোধিসত্ত্বের উপদেশে তিত্তিরের পাপবোধ দূর হলো। হাল্কা হলো মন। আর এদিকে ঘুম থেকে উঠে বোধিসত্ত্বকে প্রণাম করে খাঁচার তিত্তির সহ ব্যাধ খুশী মনে রওনা হলো তার বাড়ির দিকে। অনেক পাখি ধরা পড়েছে। হাটে বেচলে ভালো লাভ আসবে তার।

৩৫ [] মৃগালোপ-জাতক []

পুরাকালে বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্তের সময়ে বোধিসত্ত্ব শকুন হয়ে জন্মেছিলেন। তখন তাঁর নাম ছিল "অপরান্ন"। তিনি শকুনদের নিয়ে মহাসমারোহে গৃধ্রকূট পর্বতে থাকতেন।

তাঁর মৃগালোপ নামে এক ছেলে ছিলো। শকুন মৃগালোপ ছিলো খুবই শক্তিশালী। অন্য সব শকুনেরা যত উঁচুতে উড়তে পারতো—মৃগালোপ অতি সহজেই সে সীমা অতিক্রম করে চলে যেতো। অন্যান্য শকুনেরা তখন গৃধ্ররাজ অপরান্নকে সব কথা খুলে বললো, "প্রভু, আপনার পুত্র কারুর নিষেধ না মেনে আকাশের সুনীল উচ্চে উড়তে থাকে খেয়াল খুশীমত।"

তখন শকুনরাজ ছেলেকে ডেকে বল্লেন, "শুনছি তুমি নাকি আকাশের বেশী উঁচুতে উড়তে পছন্দ করো। কিন্তু সাবধান, বেশী উঁচুতে ওড়ার প্রলোভন ত্যাগ করো। না হলে অতি উচ্চে ওড়ার সময় তোমার প্রাণ যাবে। দর্প করে নিজের অধিকারের সীমা লঙ্ঘন করা উচিত নয় কখনও।"

কিন্তু মৃগালোপ পিতার অলক্ষ্যে এসব উপদেশ হেসেই উড়িয়ে দিলো। সে ছিলো ভীষণ অবাধ্য। সে বাবার কথায় কান না দিয়ে আকাশের উঁচুতে অনেক উঁচুতে উড়তে লাগলো। পিতা অপরান্ন যে সীমার কথা বলে দিয়েছিলেন তা অতিক্রম করে চললো অবহেলায়। তখন উপরের বাতাসের চাপে তার শরীর ছিন্নভিন্ন হয়ে আকাশেই ছড়িয়ে পড়লো।

এম্নিভাবে পিতার কথা না শুনে আকাশ সীমা লঙ্ঘন করার জন্য অকালে প্রাণ হারালো বলশালী শকুন মৃগালোপ। কখন ও নিজের ক্ষমতার অতিরিক্ত কিছু করতে নেই। তাতে শুধু শুধু পতন ডেকে আনা হয়।

৩৬ [] বক জাতক []

এক ছিলো নিবিড় বন। বনের ভিতরে ছিলো অনেক অনেক কাক চক্ষু জলের সরোবর। সরোবরে ফুটতো পদ্ম। নীলপদ্ম। আর ফুটতো শালুক ফুল। ভ্রমরেরা ভীড় করতো পদ্ম-মধুর লোভে। চতুর্দিক গুঞ্জরিত হতো ভ্রমরের ওড়াওড়িতে। দূর-দূর থেকে মধু নিতে আসতো শ্রমিক মৌমাছিরা।

পদ্ম-সরোবরের তীরে ছিলো বিরাট ঝাঁকড়া মাথার এক বট গাছ। বোধিসত্ত্বই ছিলেন সেই গাছ। নির্বাক বৃক্ষদেবতা হয়ে তিনি সব কিছু দেখতেন চেয়ে চেয়ে। শুনতেন সব। আর ভাবতেন মনে মনে।

পদ্ম-সরোবরের একটু দূরেই ছিলো এক পুকুর। পুকুরে থাকতো অনেক মাছ। সুখেই ছিলো তারা। কিন্তু একবার গরমের সময় পুকুরের জল প্রায় শুকিয়ে এলো। জলের অভাবে বিপদে পড়লো মাছেরা। বড়ই কষ্টের দিন শুরু হলো তাদের। পুকুরের ধারেই থাকতো এক বক। সে মনে মনে ঠিক করলো, ভুলিয়ে ভালিয়ে মিথ্যে কথা বলে মাছগুলোকে খেয়ে নেবে।

গম্ভীর হয়ে চিন্তিত মুখে বক পুকুরের ধারে বসে রইলো। মাছেরা বককে চিন্তিত দেখে জিগ্যেস করলো, "বক দাদা—কি হয়েছে তোমার? এভাবে কী ভাবছো তখন থেকে?"

"আরে চিন্তার কি শেষ আছেরে—আমি তোদের কথাই ভাবছি—"

"আমাদের জন্য তোমার কিসের চিন্তা বকদাদা—"

"আছে রে। আছে। এই যে ভয়ানক গরম পড়লো, পুকুরের

জল শুকিয়ে এলো তোরা খাবি কি? আর জল না থাকলে বাঁচবি কেমন করে?”—চিন্তার ভান করে দুঃখ প্রকাশ করলো বক। “চিন্তা করে কি করবো বকদাদা। কোন উপায়তো দেখছিনা। তুমি বলনা কি করা যেতে পারে—মাছেরা বললো। “আছে। আছে। উপায় আছে। আমি কি আর তা ভাবিনিরে! শোন, তোরা সবাই। তোরা যদি আমাকে বিশ্বাস করিস তবে এক কাজ করতে পারি আমি।—কাছেই যে পদ্মসরোবর আছে—সেখানে পাঁচ রকম পদ্মফুল ফোটে। আমি তোদের এক এক জনকে ধরে নিয়ে গিয়ে সরোবরের জলে ছেড়ে আসতে পারি।” বকের কথা শুনে মাছেরা খুবই অবাক হলো।

“কিন্তু বকদাদা, তুমিতো ভাবিয়ে তুললে আমাদের। পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোন বক মাছেদের মঙ্গল চেয়ে ভাবেনি। কি ব্যপার বলতো দাদা—আমাদের ধরে ধরে খাবার মতলব আঁটোনিতো?”

“ছিঃ ছিঃ এ কি বলছো ভাই তোমরা! আমি কখনও অধর্ম করবোনা। তোমরা আমাকে বিশ্বাস করলেও আমি তোমাদের যদি খাই, তবে মহাপাপ হবে আমার। তোমাদের মধ্যে একজন আমার সংগে চলো—নিজের চোখে পদ্ম সরোবর দেখে আসবে—পরে তোমরা ভেবে ঠিক করো কি করবে না করবে।” মিষ্টি মধুর গলায় বক মাছেদের একথা জানালো।

মাছেরা পরামর্শ করে এক বড় বোয়াল মাছকে বকের সংগে দিলো। ভাবলো, বক কখনই বোয়াল মাছকে মারতে পারবেনা। জলেও পারবেনা। ডাঙ্গাতেও না।

বক বোয়াল মাছকে পদ্মসরোবর ঘুরিয়ে আনলো। বোয়াল পদ্ম সরোবরের অনেক জল আর নানা রকম খাবার দাবারের কথা জানালো সব মাছকে। মাছেরা সব শুনে পদ্ম সরোবরে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো। বকের ওপর মিথ্যে সন্দেহ করেছিলো বলে

৩৬ [] বক জাতক []

এক ছিলো নিবিড় বন। বনের ভিতরে ছিলো অনেক অনেক কাক চক্ষু জলের সরোবর। সরোবরে ফুটতো পদ্ম। নীলপদ্ম। আর ফুটতো শালুক ফুল। ভ্রমরেরা ভীড় করতো পদ্ম-মধুর লোভে। চতুর্দিক গুঞ্জরিত হতো ভ্রমরের ওড়াওড়িতে। দূর-দূর থেকে মধু নিতে আসতো শ্রমিক মৌমাছিরা।

পদ্ম-সরোবরের তীরে ছিলো বিরাট ঝাঁকড়া মাথার এক বট গাছ। বোধিসত্ত্বই ছিলেন সেই গাছ। নির্বাক বৃক্ষদেবতা হয়ে তিনি সব কিছু দেখতেন চেয়ে চেয়ে। শুনতেন সব। আর ভাবতেন মনে মনে।

পদ্ম-সরোবরের একটু দূরেই ছিলো এক পুকুর। পুকুরে থাকতো অনেক মাছ। সুখেই ছিলো তারা। কিন্তু একবার গরমের সময় পুকুরের জল প্রায় শুকিয়ে এলো। জলের অভাবে বিপদে পড়লো মাছেরা। বড়ই কষ্টের দিন শুরু হলো তাদের। পুকুরের ধারেই থাকতো এক বক। সে মনে মনে ঠিক করলো, ভুলিয়ে ভালিয়ে মিথ্যে কথা বলে মাছগুলোকে খেয়ে নেবে।

গম্ভীর হয়ে চিন্তিত মুখে বক পুকুরের ধারে বসে রইলো। মাছেরা বককে চিন্তিত দেখে জিগ্যেস করলো, "বক দাদা—কি হয়েছে তোমার? এভাবে কী ভাবছো তখন থেকে?"

"আরে চিন্তার কি শেষ আছেরে—আমি তোদের কথাই ভাবছি—"

"আমাদের জন্য তোমার কিসের চিন্তা বকদাদা—"

"আছে রে। আছে। এই যে ভয়ানক গরম পড়লো, পুকুরের

জল শুকিয়ে এলো তোরা খাবি কি? আর জল না থাকলে বাঁচবি কেমন করে?"—চিন্তার ভান করে দুঃখ প্রকাশ করলো বক। "চিন্তা করে কি করবো বকদাদা। কোন উপায়তো দেখছিনা। তুমি বলনা কি করা যেতে পারে—মাছেরা বললো। "আছে। আছে। উপায় আছে। আমি কি আর তা ভাবিনিরে! শোন, তোরা সবাই। তোরা যদি আমাকে বিশ্বাস করিস তবে এক কাজ করতে পারি আমি।—কাছেই যে পদ্মসরোবর আছে—সেখানে পাঁচ রকম পদ্মফুল ফোটে। আমি তোদের এক এক জনকে ধরে নিয়ে গিয়ে সরোবরের জলে ছেড়ে আসতে পারি।" বকের কথা শুনে মাছেরা খুবই অবাক হলো।

"কিন্তু বকদাদা, তুমিতো ভাবিয়ে তুললে আমাদের। পৃথিবী সৃষ্টি হওয়ার পর থেকে আজ পর্যন্ত কোন বক মাছেদের মঙ্গল চেয়ে ভাবেনি। কি ব্যপার বলতো দাদা—আমাদের ধরে ধরে খাবার মতলব আঁটোনিতো?"

"ছিঃ ছিঃ এ কি বলছো ভাই তোমরা! আমি কখনও অধর্ম করবোনা। তোমরা আমাকে বিশ্বাস করলেও আমি তোমাদের যদি খাই, তবে মহাপাপ হবে আমার। তোমাদের মধ্যে একজন আমার সংগে চলো—নিজের চোখে পদ্ম সরোবর দেখে আসবে—পরে তোমরা ভেবে ঠিক করো কি করবে না করবে।" মিষ্টি মধুর গলায় বক মাছেদের একথা জানালো।

মাছেরা পরামর্শ করে এক বড় বোয়াল মাছকে বকের সংগে দিলো। ভাবলো, বক কখনই বোয়াল মাছকে মারতে পারবেনা। জলেও পারবেনা। ডাঙ্গাতেও না।

বক বোয়াল মাছকে পদ্মসরোবর ঘুরিয়ে আনলো। বোয়াল পদ্ম সরোবরের অনেক জল আর নানা রকম খাবার দাবারের কথা জানালো সব মাছকে। মাছেরা সব শুনে পদ্ম সরোবরে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো। বকের ওপর মিথ্যে সন্দেহ করেছিলো বলে

লজ্জিত হলো তারা। বকের সঙ্গে যেতে আর কোনরকম আপত্তি করলোনা তারা।

প্রথমেই বকের সংগে চললো সেই বোয়াল মাছ। বোয়াল মাছকে গাছের গায়ে আছাড় মেরে মারলো বক। পেট পুরে মাছ খেয়ে সাধুর মত মুখ করে বক এসে দাঁড়ালো মাছেদের কাছে —"বোয়ালকে সরোবরে ছেড়ে এলাম। জলে যেয়ে সে কি আনন্দ তার। সে এখন মনের সুখে মিষ্টি শ্যাওলা খাচ্ছে—এবারে বলো, আর কে যাবে আমার সংগে—"

এমিভাবে বক প্রতিদিন পুকুর থেকে মাছ তুলে এনে সরোবরে ছেড়ে দেবার নাম করে খেয়ে চললো। অবশেষে পুকুরে আর একটি মাছ ও রইলোনা। থাকার মধ্যে রইলো বড়সড় এক লাল কাঁকড়া। বক শুনেছিলো যে, কাঁকড়ার ভেতরের হলুদ কুসুম খেতে খুব ভালো। সে তাই কাঁকড়াকে খাবে বলে ঠিক করলো। "আরে ভাই কাঁকড়া কী খবর তোমার? কতদিন দেখিনি তোমাকে—সবাইকেতো পদ্মসরোবরে রেখে এলাম—কী সুখে আছে তারা সেখানে। চল, এবার তোমাকেও রেখে আসি—"

বকের কথা শুনে কাঁকড়া মনে মনে চিন্তা করলো, "যতোই সাধু সেজে থাকুকনা কেন, বকের কথা বিশ্বাস করা ঠিক হবেনা! মন বলছে, বক সব মাছকেই মেরে খেয়েছে।"

বকের কথামতো কাঁকড়া বকের গলা জড়িয়ে ধরলো। ভান করলো, সে বড়ই ভয় পেয়েছে। বক কাঁকড়াকে সরোবর দেখিয়ে পরে গাছের দিকে নিয়ে চললো। কাঁকড়ার চোখে পড়লো, গাছের তলায় অসংখ্য মাছের কাঁটা পড়ে আছে। সে বকের ভণ্ডামী ধরতে পারলো। তবুও না বোঝার ভান করে বললো "মামা, এদিকে কোথায় চল্লে উল্টোদিকে। সরোবর তো ওদিকে নয়।" কাতর গলায় বললো কাঁকড়া।

"চুপ কর ব্যাটা! কে তোর মামা? আমি তোর বাপের

চাকর যে তোকে ঘাড়ে করে ঘুরবো। গাছের নীচে মাছের কাঁটা দেখছিস্—তোকেও মারবো। যেমন করে মাছগুলোকে খেয়েছি—তোকেও খাবো।" ধমকে উঠলো বক।

"আমাকে খাওয়ার সাধ্য তোমার নেই মামা। আজ তোমার মরণ ঘনিয়ে এলো আমার হাতে। আমার ধারালো দাঁড়া দিয়ে সাঁড়াশীর মত টিপে ধরবো তোমার গলা। আস্তে আস্তে কাটবো তোমার নরম গলা। যদি মরি দু'জন এক সংগেই মরবো। তবে তোমাকে ছাড়ছিনা কিছুতেই"—কথা শেষ করেই ধারালো ঠ্যাং দিয়ে বকের গলায় চাপ দিতে লাগলো কাঁকড়া। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠলো বক। চোখ দিয়ে জল বেরিয়ে এলো। প্রাণভয়ে স্বার্থপর বক মিনতি করলো, "আমি—তোমাকে—আপনাকে কখনো খাবোনা আর। দয়া করে আপনি আমাকে প্রাণে মারবেন না—ছেড়ে দিন আমাকে—"ঠিক আছে। যদি বাঁচতে চাও, তবে আমাকে পদ্ম—সরোবরের কাছে নিয়ে চল। জলে ছেড়ে দাও আমাকে—"

প্রাণ বাঁচানোর তাগিদেই বক কাঁকড়াকে নিয়ে দ্রুত সরোবরের জলের ধারে এলো। যেইমাত্র কাঁকড়া জলের গন্ধ পেলো—তখনই প্রাণপণ শক্তিতে ধারালো দাঁড়া দিয়ে কেটে ফেললো বকের গলাকে।

এম্নিভাবে বকের মাথা কেটে ফেলে কাঁকড়া ঢুকে পড়লো সরোবরের গভীরে।

বৃক্ষদেবতারূপী বোধিসত্ত্ব কাঁকড়ার বুদ্ধি দেখে মনে মনে প্রশংসা করলেন তাকে।

লোভে পাপ—পাপে মৃত্যু। মরে গিয়ে বক একথাই প্রমাণ করলো।

৩৭ [] কৃষ্ণজাতক []

তখন বারাণসীর রাজা ছিলেন ব্রহ্মদত্ত। বোধিসত্ত্ব জন্মেছিলেন গরু হয়ে। তখন খুবই অল্প বয়স বোধিসত্ত্বের। এক বৃদ্ধার বাড়িতে ভাড়া থাকতো বোধিসত্ত্বের প্রভু। লোকটি ছিল খুবই গরীব। বাড়িভাড়ার অর্থ ঠিকমতো দিতে না পেরে সে পরিবর্তে বৃদ্ধাকে বোধিসত্ত্বকে দিয়ে দিলো। নিজে অন্যত্র চলে গেলো। কালো রং ছিলো বলে সবাই বোধিসত্ত্বকে কালু বলে ডাকতো।

গরু হলেও নিজের ছেলের মতই আদর যত্নে মানুষ হতে লাগলেন বোধিসত্ত্ব বুড়ীর কাছে। ভাত, ফেন, শাকসব্জী, ফলমূল আর ভালো ভালো ভালো খাবার দাবার খেয়ে বোধিসত্ত্ব হয়ে উঠলেন খুবই বলশালী। গ্রামে অন্যসব গরুর সঙ্গে বোধিসত্ত্ব চরতে যেতেন মাঠে। তিনি ছিলেন খুবই শান্ত। কালো মিশমিশে প্রকাণ্ড চেহারার বোধিসত্ত্বকে গ্রামের ছোট ছেলেরাও এতটুকু ভয় পেতোনা। ছেলেরা কেউ তাঁর প্রকাণ্ড শিং ধরে, কেউ তাঁর কান ধরে ঝুলতো। কেউ বা লেজ ধরে টানাটানি করতো। কেউ কেউ পিঠেও চড়তো। গ্রামের কোন লোকের ক্ষেতের ফসল খেয়ে বা বেড়া ভেংগে কখনও অনিষ্ট করতেন না তিনি। তিনি ছিলেন খুবই বুদ্ধিমান আর বিবেচক।

বোধিসত্ত্বের মায়ের মতই ছিলেন স্নেহশীলা সেই বৃদ্ধা। তাঁকে প্রাণ দিয়ে ভালবাসতেন তিনি। মাঠে চরার সময় বা নদীতে জল খাওয়ার সময় বোধিসত্ত্ব মনে মনে ভাবতেন, "আমার মা অনেক কষ্ট করে আমাকে খাইয়ে পরিয়ে বড় করেছেন। জীবনে কখনও সুখ পাননি তিনি। আর্থিক কষ্টে দিন কেটেছে তার আমার জন্য। আমি মাকে সুখী করবোই। অর্থ উপার্জনের চেষ্টা করবো এখনথেকে—"

একদিনের ঘটনা। বোধিসত্ত্ব চরছিলো নদীর তীরে। সেদিন

এক বণিক প্রচুর মালপত্র নিয়ে যাচ্ছিলো নদীর তীরের পথ ধরে। তার সংগে ছিলো পাঁচশো মালবোঝাই গরুর গাড়ি। হাজার বলদে টানছিলো তা। কয়েকদিন আগেই প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়েছিলো। পথের মাঝখানে ছিলো কাদাজল ভর্তি এক গর্ত। গরুর গাড়ি কিছুতেই সেই গর্ত পেরিয়ে যেতে পারছিলো না। হাজার গরু এক সংগে গাড়িতে জুড়ে দেওয়া হলো, তবুও কিছুতেই টানতে পারছিলোনা গাড়ি। কাদাতে বসে গেলো গরুর গাড়ির চাকা। কোনো উপায় না দেখে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো সেই বণিক। এদিকে আকাশে অবস্থাও ভালো ছিলোনা। অনেকটা পথ এখনও পাড়ি দেওয়া বাকী ছিলো। বৃষ্টি এলে মালপত্রগুলো ভিজে গেলে প্রচুর অর্থ দণ্ড দিতে হবে বণিককে। সেই বণিকপুত্র ছিলো খুবই বুদ্ধিমান। সে গরু চিনতো। উৎকৃষ্ট গরু চিনতে ভুল হতোনা তার। বোধিসত্ত্ব যখন দূরের মাঠে চরছিলো বণিক তাঁকে দেখেই বুঝলো এ গরু একাই একশো। গাড়ি টানার পক্ষে খুবই উপযুক্ত। গরুর পাল থেকে আলাদা করে বোধিসত্ত্বকে নিয়ে আসার ইচ্ছা হলো তার। রাখাল বালকদের কাছ থেকে বোধিসত্ত্বের সব কথা জেনে নিলো বণিক।

কিন্তু বোধিসত্ত্বের নাকে দড়ি দিয়ে টেনে নেবার চেষ্টা করে সে কিছুতেই সফল হলোনা। এক পাও নড়লেননা বোধিসত্ত্ব। বণিক তখন ভাবলো, ভাড়ার ব্যাপারে কথাবার্তা ঠিক না করে নিলে এক পাও নড়বেনা বোধিসত্ত্ব। সে তখন বোধিসত্ত্বকে জানালো, "আমার পাঁচশো গরুর গাড়ি কাদা থেকে পার করে দিলে প্রতি গাড়ি পিছু দু'মুদ্রা দিতে রাজী। সব শুদ্ধ তা হলে হবে এক হাজার মুদ্রা।" বোধিসত্ত্ব শিং নেড়ে সম্মতি দিলেন। বেজে উঠলো গলাতে ঝোলানো পেতলের ঘণ্টা। জোর করতে হলো না। তিনি এগিয়ে গেলেন গরুর গাড়িগুলোর দিকে। একে একে পার করলেন সব কটা গাড়িকে।

বণিকপুত্র ভাবলো, গরুর আবার বুদ্ধি কি? এক একমুদ্রা করে পাঁচশো গাড়ির জন্য পাঁচশো মুদ্রা দিলেই যথেষ্ট। এই ভেবে

পাঁচশো মুদ্রা চামড়ার থলেতে পুরে বোধিসত্ত্বের গলায় বেঁধে দিলো সে। কিন্তু বোধিসত্ত্ব বুঝতে পারলেন চতুর বণিক কথা না রেখে ঠকিয়ে চলে যাবার তাল করেছে। বনিককে যেতে দেবেন না ঠিক করলেন তিনি। ছুঁচালো শিং দিয়ে বণিকের পেটে আলতো করে ছুঁয়ে তিনি তার পথ আটকালেন। বণিক ভাবলো, এ সাধারণ গরু নয়। একে ফাঁকি দিলে বিপদ কেউ ঠেকাতে পারবে না। ত্রস্ত ব্যস্ত হয়ে ফতুয়ার পকেট থেকে বাকি পাঁচশো মুদ্রা বের করে নিয়ে সে চামড়ার থলেতে পুরে দিয়ে পুনরায় বোধিসত্ত্বের গলায় বেঁধে দিলো।

বোধিসত্ত্ব বুঝলেন বণিক এতক্ষণে তাঁর প্রাপ্য পারিশ্রমিক দিয়েছে। তিনি তখন বাড়ির পথে চললেন। পেছনে পেছনে চললো গ্রামের কয়েকশো ছোট ছোট ছেলেমেয়ে। তারা চীৎকার করতে করতে চল্লো, "বুড়ীর গরু কালু কি এনেছে তোমরা সবাই দেখো। অনেক অনেক টাকা এনেছে—" বোধিসত্ত্ব কৃত্রিম রাগে তাদের তাড়া করলেন। ভয় পেয়ে চীৎকার চেঁচামেচি থামিয়ে ছুটে পালালো বাচ্চা ছেলেরা।

বোধিসত্ত্ব নিজের বাড়ির উঠানে ঢুকেই মাটিতে পা ছড়িয়ে বসে পড়লেন। তিনি ছিলেন খুবই ক্লান্ত। অত্যধিক পরিশ্রমে তার সারা শরীর থেকে ঘাম বেয়ে পড়ছিলো। ছ'চোখ লালচে দেখাছিলো করমচার মতো।

বোধিসত্ত্বের মা ছুটে এসে গলা জড়িয়ে ধরলেন তাঁর। ঘাম মুছিয়ে ছিলেন মমতায়। রাখালদের মুখ থেকে সব শুনে চোখে জল চলে এলো তাঁর আনন্দে। চামড়ার থলেতে পোরা টাকাটা তুলে নিলেন। তেল মাখিয়ে গরম জলে চান করিয়ে দিলেন ছেলেকে। গা মুছিয়ে দিয়ে সামনে বসিয়ে কচি সবুজ ঘাস, ভূষি, খোল, গুড়, ভাতের ফেন আর তরকারি খাওয়ালেন।

এমিভাবে মা ও ছেলের মত একত্রে সুখে বাস করতে লাগলেন বোধিসত্ত্ব ও সেই বৃদ্ধা।

রাজা শুয়েছিলেন তাঁর রাজকীয় সোনার কারুকাজ করা বিছানাতে। কিন্তু ভোর রাতে দুঃস্বপ্ন দেখে ভয়ে চীৎকার করে জেগে উঠলেন কোশল রাজ। ঘুম আসাতো দূরের কথা; দুধের মত শাদা নরম বিছানাতেও তিনি ভোর না হওয়া পর্য্যন্ত ছটফট করে কাটালেন। কী এক অজানা মৃত্যু ভয়ে দম বন্ধ হয়ে আসার উপক্রম হলো তাঁর। কিছুই ভালো লাগছিলো না যেন! সব কিছুই অসার অর্থহীন আর মিথ্যা বলে মনে হচ্ছিলো।

আস্তে আস্তে ফুল ফোটার মতই আলো ফুটে দিন হলো চতুর্দিকে। সোনা রং আলোর আলপনাতেও খুশী মনে নিঃশ্বাস নিতে পারছিলেন না তিনি। রাজার জীবনের আলো যেন কেউ এক ফুঁয়ে নিভিয়ে দিতে চাইলো। সেই সব স্বপ্নেরা অশ্বারোহী দস্যুর মতই ঘোড়া ছুটিয়ে ধূলো উড়িয়ে চলে যাচ্ছিলো রাজার মনের ওপর দিয়ে। শান্তি-ভিখিরি রাজা স্থির থাকতে না পেরে অসময়ে খুবই সকালে চলে এলেন রাজসভায়। যেন এক স্থাবর জবুথবু বৃদ্ধ স্বর্ণসিংহাসনে এসে বসলেন। তাকালেন নীরক্ত চোখে, উদাস লক্ষ্যে মন্ত্রীমণ্ডলী ও অন্যান্য সভাসদের দিকে।

রাজপুরোহিত এবং ব্রাহ্মণেরা ব্যাকুল আর্তনাদেই যেন জানতে চাইলেন, "মহারাজ, অপরাধ নেবেন না। কাল রাতে ভালো ঘুম হয়েছিলেতো? আপনাকে এরকম অসুস্থ লাগছে কেন? কী হয়েছে আপনার?" ব্যথিত গলায় কোন রকমে রাজা উচ্চারণ করলেন, "মনটা একদম ভালো নেই। কাল রাতে আমি কতগুলো ভয়ংকর দুঃস্বপ্ন দেখলাম। দেখে অব্দি দুঃশ্চিন্তায় আমার স্নায়ু ছিঁড়ে যাচ্ছে। মনে হচ্ছে এক ভয়াবহ রাক্ষুসে দিন আমাদের

সামনে জোর কদমে এগিয়ে আসছে—"ক্রমে ক্রমে রাজা সমবেত সভাসদদের সামনে সব স্বপ্নের কথা খুলে বল্লেন।

রাজার কথা হলে পর সমস্ত রাজসভায় এক নীরব স্তব্ধতা নেমে এলো ঘনকালো মেঘের মত। থেমে রইলো বাতাস। বজ্রপাতের শব্দেই যেন শাস্ত্রজ্ঞ কুলপুরোহিত ঘোষণা করলেন, "মহারাজ, এসব দুঃস্বপ্নের ফল খুবই খারাপ। রাজ্যনাশ—প্রাণনাশ নয় অর্থনাশ অবশ্যম্ভাবী। দেশে আকাল, বন্যা, মহামারী, খরার প্রকোপ দেখা দেবে খুব শীগগীরই।". চিন্তায় দু'ভুরুর মাঝখানে খাঁজ পড়লো তাঁর।

"কি করলে এ বিপদ থেকে প্রজাদের রক্ষা করতে পারবো, রাজ্য বাঁচাতে পারবো—আপনারা আমাকে বলে দিন—" "ভয় নেই মহারাজ। আমরা এর প্রতিবিধান করবো। এক মহা 'চতুষ্পথ' যজ্ঞ করবো। সমস্ত অমঙ্গল অশান্তিকে দূরে তাড়িয়ে দেবে এ শান্তি স্বস্ত্যয়ন। তবে কিনা মহারাজ এতে প্রচুর অর্থ আর ধনসম্পদ লাগবে—" "রাজকোষ খুলে দিচ্ছি। যত ইচ্ছে খরচ করুন। শুধু দেখবেন, দেশ ও জাতি যেন এ আসন্ন বিপদ থেকে সত্বর পরিত্রাণ পায়—" রাজা তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করলেন মন্ত্রী-মণ্ডলীর কাছে। আচার্য্য পুরোহিতের কাছে।

ব্রাহ্মণেরা আনন্দে আটখানা হলেন। যজ্ঞের সুযোগে অনেক অনেক ধনসম্পদ সোনাদানা, কাপড়চোপড়, তেল, নুন, ঘি, জমিজমা, গরু, মোষ, ছাগল মিলবে দানসামগ্রী হিসাবে। কয়েক মাস ধরে যজ্ঞের আয়োজন আর উপলক্ষ্যে চর্ব্ব চুষ্য খাবারদাবার জুটবে পেটপুরে।

নগরের বাইরে খোঁড়া হলো যজ্ঞকুণ্ড। যেন এক ছোটখাটো পুকুর। বলির জন্য আনা হলো হাজার হাজার পাখি, ভেড়া, কচি ছাগল আর বুড়ো মোষ। দানের জন্য আনা হলো লক্ষ লক্ষ দুগ্ধবতী গাভী। এম্নিভাবে মহাধূমধামে যজ্ঞের আয়োজন শুরু হলো সারা

রাজ্য জুড়ে। এক হৈ-হৈ রৈ-রৈ অবস্থা চললো চারিদিকে। রাজমহিষী এ সবের কিছুই জানতেন না। অবারিত রাজকোষ দেখে তিনি স্তম্ভিত। রাজমহিষী মল্লিকাদেবী খুবই অবাক হলেন যজ্ঞের আয়োজন দেখে। রাজার কাছে দুঃস্বপ্নের কথা শুনে তিনি খুবই বিমর্ষ হলেন। কিন্তু অজস্র অর্থ ব্যয় করে স্বপ্নের প্রতিকার স্বরূপ এ যজ্ঞ করা তাঁর পছন্দ হলো না। তিনি ছিলেন সত্যিকারের সুন্দরী। বুদ্ধিমতী। হৃদয়বতী। রাণী মল্লিকাদেবী ছিলেন বুদ্ধদেবের পূজারীনী। তাঁর অন্তরের সমস্ত শ্রদ্ধাঞ্জলী তিনি নিবেদন করেছিলেন বোধিসত্ত্বের চরণতলে।

রাণী মল্লিকা রাজাকে অনুরোধ করলেন, "মহারাজ, যদি অনুমতি করেন—তবে একটা কথা বলতে পারি। শুনেছি নগরের বাইরে বিশাল এক আম্রকাননে কয়েক হাজার অনুগামী সহ স্বয়ং বোধিসত্ত্ব অবস্থান করছেন। তিনি ত্রিকালদর্শী। ত্রিলোকশ্রেষ্ঠ। সর্বজ্ঞ। বিশুদ্ধ। নিষ্কলঙ্ক মহাপুরুষ। পৃথিবীতে তাঁর চেয়ে জ্ঞানী-পুরুষ আর কে আছেন? তিনি-ই আপনার এসব দুঃস্বপ্নের সঠিক ব্যাখ্যা করতে পারবেন। মহারাজ, আপনি আর দেরী করবেন না। অনুগ্রহ করে আপনি জ্ঞানী বোধিসত্ত্বের দর্শন লাভ করুন। সব ঠিক হয়ে যাবে।"

"এ অতি উত্তম প্রস্তাব মহারাণী। আমি এক্ষুনি সেই মহাপুরুষের কাছে চল্লাম।"

নিবিড় সেই আম্রকাননে বোধিসত্ত্বের চরণতলে বসে রাজা একে একে সব কথা খুলে বলতে লাগলেন বিনম্র চিত্তে···

প্রথম স্বপ্ন ঃ

কোশল রাজ বল্লেন, "দেখলাম, তেল চকচকে কুচকুচে কালো চারটে ষাঁড় তর্জনগর্জন করে তেড়ে এলো পরস্পরের দিকে। লোক জমে গেলো ষাঁড়ের লড়াই দেখবে বলে। কিন্তু যুদ্ধ না করে, লড়াইয়ের ভান করে পা ঠুকেই কেটে পড়লো তারা। এরকমতো

কখনও দেখিনি। এর মানে কি প্রভু ?" বোধিসত্ত্ব বললেন, "অনেক অনেক দিন পরে পৃথিবীতে এক ঘোর অমঙ্গল অরাজকতা নেমে আসবে। মানুষ তখন অধার্মিক, কৃপণ আর ভয়ংকর স্বার্থপর হয়ে উঠবে। মাঠে ফলবেনা ফসল। গাছে ফলবেনা ফুল-ফল। আকাশে জলবাহী মেঘ দেখা দেবে, কিন্তু হবেনা বর্ষণ। কালো কালো মেঘ দেখে চাষে উৎসাহী হবে চাষী, কিন্তু মিথ্যে আশা দিয়ে দূরে—অনেক দূরে উড়ে চলে যাবে মেঘরাজী। ঠিক যেন আপনার দেখা স্বপ্নের মত। তবে আপনার চিন্তার কোন কারণ নেই এতে।' সুস্মিত হাসলেন তিনি।

দ্বিতীয় স্বপ্ন ঃ

কোশলরাজ বল্লেন, "প্রভু, আমি দেখলাম সারা পৃথিবীতে যেন অসংখ্য গাছপালা লতা গুল্ম জন্মাতে লাগলো। তৃণের মত ক্ষুদ্র থেকে হাতির চেয়ে বড়ো গাছপালায় ভরে উঠলো পৃথিবীর মাটি। আর জন্মেই অসময়ে ফুল গাছে ফুল ফুটলো। ফলগাছে ধরলো ফল। আর অবাক কাণ্ড—এতটুকু গাছে ফললো বিরাট বিরাট সব ফল। গাছের চেয়ে বড় হলো ফুল। এর অর্থ কি ভদন্ত ?"

বোধিসত্ত্ব বল্লেন, "মহারাজ, যখন এসব ঘটবে তখন মানুষের আয়ু হবে খুব কম। অনিয়ম, উচ্ছৃংখলতায় বিষিয়ে উঠবে পৃথিবীর আকাশ-বাতাস, মাটি-জল। মানুষের চরিত্রের অবনতি ঘটবে খুবই। তবে এতে এখনই আপনার দুশ্চিন্তার কোন কারণ নেই। এবারে বলুন তৃতীয় স্বপ্ন কি ?"

তৃতীয় স্বপ্ন ঃ

কোশলরাজ বল্লেন, "প্রভু, আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখলাম। বুড়ো ধেড়ে গাইগরু তারই সদ্যোজাত বাছুরের দুধ খাচ্ছে। এর মানে কি জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ ?"

বোধিসত্ত্ব বল্লেন, "এতে আপনার এ মুহূর্তে চিন্তার কিছু নেই। সুদূর ভবিষ্যতে ঘটবে এসব। তখন তরুনেরা বৃদ্ধদের সম্মান

করবেনা। কথায় কথায় প্রতি কাজে তাঁদের প্রতি অবজ্ঞা আর অবহেলার ঘৃণা ছুঁড়ে দেবে। সংসারে সব কাজে যুবকেরাই নেতৃত্ব দেবে। বৃদ্ধেরা হবেন তাদের আজ্ঞাবহ দাস। পিতামাতাকে ছেলেমেয়ের দয়ার ওপরেই বেঁচে থাকতে হবে। ইচ্ছে করলে ছেলেমেয়েরা বৃদ্ধ বাবা-মাকে খেতেপরতে দেবে, নইলে দূর—দূর করে তাড়িয়ে দেবে। এবারে বলুন মহারাজ আপনার চতুর্থ স্বপ্ন কি?"

চতুর্থ স্বপ্ন ঃ

কোশলরাজ বল্লেন, "লোকেরা বিরাট বিশাল জোয়ান-কর্মক্ষম যণ্ডদের গাড়ি থেকে খুলে দিয়ে—রুগ্ন-জীর্ণ-দুর্বল অল্পবয়সী বলদদের গাড়িতে জুড়ে দিচ্ছে। অথচ মালবোঝাই গরুর গাড়ী টেনে নেবার একতিল ক্ষমতাও কচি বলদগুলোর নেই। ফলে গাড়িগুলো এক পাও এগোলো না। এক জায়গাতেই পড়ে রইলো। প্রভু এর অর্থ কী?"

উত্তরে বোধিসত্ত্ব বল্লেন, "অনেক অনেক পরে এরকম ঘটবে। এখন নয়। তখন অশিক্ষিত, বর্বর, তস্কর আর ধাপ্পাবাজরাই রাজ্যের প্রশাসন চালাবে। বিচক্ষণ, যোগ্য, প্রবীণ, সুপণ্ডিত কর্মকুষল ব্যক্তিদের যোগ্যতার দাম কেউ দেবেনা। অল্পবয়সী তরুণরাই সব দায়িত্বপূর্ণ কাজে বহাল হবে। অথচ সে দায়িত্ব পালন করার যোগ্যতা তাদের নেই। ফলে রাজ্যের অবস্থা হবে অপটু নাবিকের হাতে পড়ার মত বা ওই স্বপ্নের গরুর গাড়ির মতই অচল-অনড়। বলুন পরের স্বপ্ন কি?"

পঞ্চম স্বপ্ন ঃ

কোশলরাজ বল্লেন, "সে এক অদ্ভুত স্বপ্ন প্রভু। দেখলাম এক শাদা ঘোড়াকে। তার দুটি মুখ। সহিসেরা দু' মুখেই ঘাস দানা দিচ্ছে আর ঘোড়াটা গোগ্রাসে দু'মুখ দিয়েই গিলছে তা। এর অর্থ কি প্রভু?"

উত্তরে বোধিসত্ত্ব জানালেন, "সুদূর ভবিষ্যতে যা ঘটতে চলছে

আপনি তা এখনই দেখেছেন মহারাজ। তখন অসৎ, অধার্মিক, লোভী, অর্থপিশাচ ব্যক্তিরাই বিচার বিভাগের সবরকম বিচারকের পদ অলংকৃত করবেন মহাসমারোহে। আপনার স্বপ্নের ঘোড়া যেমন দু'মুখেই ঘাস খেয়েছে—এসব বিচারকেরাও আসামী—ফরিয়াদী দু'তরফ থেকেই ঘুষ নেবে অম্লান হাসি হাসি মুখে। এবারে বলুন অন্য স্বপ্নের কথা ?"

ষষ্ঠ স্বপ্ন ঃ

কোশলরাজ বললেন, "দেখলাম রাজ প্রাসাদে ঢোকার মুখেই একটি বিরাট কলসী রয়েছে। কলসী জলে পরিপূর্ণ। বড় কলসীটির চারিদিকে ছড়ানো রয়েছে অনেক অনেক ছোট ছোট কলসী। কলসীগুলি খালি। অথচ মজার ব্যাপার হলো কাতারে কাতারে লোক ঘটে জল এনে কেবল বড় কলসীতেই জল ঢেলে চলেছে। বড় কলসী উপচে চতুর্দিক জলে জলময় হয়ে উঠছে, তবুও লোকেরা ভুলেও কেউ সেদিকে দেখছেনা বা ছোট ছোট খালি কলসগুলোতে জল ঢালতে বিন্দুমাত্র আগ্রহী হচ্ছেনা। কলসগুলো তাতে করে খালি-ই থেকে যাচ্ছে। এর কারণ কি ভদন্ত ?"

বোধিসত্ত্ব উত্তরে বল্লেন, "এসবও ঘটতে অনেক দেরী আছে। আপনার চিন্তা করার কিছু নেই। এমন এক সময় আসবে যখন রাজার কোষাগার হবে শূন্য। রাজাদের অভাব অনটন লেগেই থাকবে। রাজার অভাব মেটাতে অর্থ জোগাতে সাধারণ মানুষ করভারে জর্জরিত হবে। চাষী, তাঁতী, জেলে, কামার, কুমোর, মজুর, রাজমিস্ত্রি, ব্যবসায়ী আর কারিগর উদয়াস্ত পরিশ্রম করে রাজার কোষাগার পূর্ণ করবে। কিন্তু তাদের নিজেদের অবস্থা হবে শূন্য কলসীর মত—তবুও সেদিকে তাকানোর মত ফুরসত মিলবেনা তাদের।"

সপ্তম স্বপ্ন ঃ

কোশলরাজ বল্লেন, "স্বপ্নে দেখলাম, বাজারে বেশ ঘটা করে

পচা খোল বিক্রি হচ্ছে—আর পাশেই দোকানে পচা ঘোলের দামে লক্ষ টাকা দামের সুগন্ধী চন্দনকাঠ বিক্রি হচ্ছে, অথচ লোকে কিনছে না। এর কী অর্থ প্রভু?"

বোধিসত্ত্ব বিষন্ন হলেন, "আমি যে ধর্মের কথা বলছি—যে মত ও পথের কথা বলছি—লোকে কালে কালে তা ভুলে যাবে। ধর্ম উপদেশকে অবহেলায় বর্জন করবে। আমি বারবার বলেছি, লোভে পাপ। অথচ ভিক্ষুরাই ধর্মকথাকে জীবিকা করে উপার্জন করবে ধন-সম্পদ, পোশাক পরিচ্ছদ। হাটে-বাজের মাঠে-ঘাটে ধর্মোপদেশ দেবার ছলে মানুষকে ঠকিয়ে সামান্য পয়সাকড়ি, কাপড় চোপড় আর খাবারদাবার পাওয়ার লোভে সন্ন্যাসীরা উপদেশ দেবার আশ্রম খুলে বসবে। ধর্মোপদেশ চন্দন কাঠের মতই দামী-সুগন্ধী। অথচ সামান্য খাওয়াপরার লোভে সন্ন্যাসীরা তা বিক্রি করতে কুণ্ঠিত হবে না। বলুন পরের স্বপ্ন কি মহারাজ?"

অষ্টম স্বপ্ন ঃ

কোশলরাজ বল্লেন, "দেখলাম, যেন একটা ফাঁপা লাউয়ের খোল জলে ডুবে যাচ্ছে। এর ফল কি হবে প্রভু?

উত্তরে বোধিসত্ত্ব বল্লেন, 'সুদূর ভবিষ্যতে এসব ঘটবে। পৃথিবী তখন পাপে ভরে উঠবে। পৃথিবী বিপথে চলবে। রাজদ্বারে, মন্ত্রভবনে, বিচারশালাতে সর্বত্র অসৎ, অশিক্ষিত, বর্বর, লোভী শয়তানদের কদর হবে। ফাঁপা, অন্তঃসারশূন্য, নিজের ঢাক নিজে নিজে পেটানো লোকেরাই-সব জায়গাতে মাতব্বরী মারবে। অথচ সত্যিকার ভালো, বিনয়ী, বিদ্বান, সরল আর মহৎ প্রাণের মানুষেরা সব জায়গাতে অপমানিত হবেন। অবহেলা আর অনাদরে কাটবে তাঁদের দিন। 'এম্নি করে রাজসভায়, সমাজে সন্ন্যাসীদের মধ্যে শয়তান তার প্রভাব বিস্তার করবে। আপনার পরের স্বপ্নের কথা বলুন মহারাজ?"

নবম স্বপ্ন ঃ

কোশলরাজ বল্লেন, "দেখলাম প্রকাণ্ড চওড়া এক নদী। আর তাতে বড় বড় নৌকার মত ভারি ভারি পাথর জলে ভেসে চলেছে। এর ফল কি প্রভু?

উত্তরে বোধিসত্ব বল্লেন, 'এমন এক সময় পৃথিবীতে আসবে—যখন সত্যিকারের জ্ঞানীগুণী মহৎপ্রাণ মানুষ কোন কাজে কোথায়ও আমল পাবেন না। তাঁদের কথা আর কাজ বাজে অসার মানুষের কথার তোড়ে আবর্জনার মতই ভেসে চলে যাবে। বলুন, এর পরের স্বপ্ন কি?"

দশম স্বপ্ন:

কোশলরাজ বল্লেন, "এতকাল দেখেছি—জেনেছি—এখন ও দেখছি বাঘ ছাগল মারে অনায়াসে। ছাগল শিকার করে তার মাংস খেতে ভালোবাসে বাঘ। কিন্তু স্বপ্নে দেখলাম ঠিক উল্টো ঘটনা।

দেখলাম, কচি কচি ছাগলেরা বড় বড় বাঘ মেরে ফেলে অনায়াসে তাদের মাংস খাচ্ছে পেট পুরে। ছাগলকে দূর থেকে আসতে দেখেই বাঘেরা ল্যাজ গুটিয়ে ভয়ে চোঁ-চোঁ-দৌড় মেরে পালিয়ে যাচ্ছে। এ স্বপ্নের কি ফল ধার্মিকশ্রেষ্ঠ?'

উত্তরে বোধিসত্ত্ব বলেন, "এতে এ মুহূর্তে আপনার কোনরকম ভয়ের কারণ নেই। ভবিষ্যতে এমন অরাজক দিন আসবে। তখন রাজা অযোগ্য লোককে বেশী পছন্দ করবেন। বড়ো বড়ো দায়িত্বপূর্ণ পদে অযোগ্য চাটুকার লোককে এনে বসাবেন। শিক্ষিত—গুণী, কাজ জানা যোগ্য ব্যক্তি অপমানিত হবেন—কোথাও পাবেননা সম্মান। কেউ-ই পাত্তা দিতে চাইবেনা। এম্নিভাবে প্রশাসনে—বিচার বিভাগে সর্বত্র অযোগ্য লোকেরাই বহাল তবিয়তে জেকে বসবে আসনে। তারা হয়ে উঠবে রাজার শুভাকাঙ্খী। প্রিয়পাত্র। তাদের কথায় রাজা ওঠাবসা করবেন। অন্যায়ভাবে ভালো লোকের জমিজমা ধন সম্পত্তি কেড়ে নেবে রাজার পার্শ্বচরেরা। দেশে আইন আদালত বলে কিছু থাকবেনা। গরীব লোকেরাও

এদের অন্যায় অবিচারের হাত থেকে রেহাই পাবেনা। বিনা বিচারে তাদের ভিটেমাটিও গ্রাস করবে অসৎ লোকের। বিচার-শালাতে বিচারের নামে চলবে অবিচার। কেউ আর নালিশ করতে ভয়ে যাবেনা বিচারালয়ে। দেশের সাধারণ মানুষ মুখ বুজে এসব অত্যাচার নীরবে সহ্য করবে। অন্যায়, অবিচার, অধর্ম অত্যাচারের পাপ হয়ে উঠবে সর্বত্রগামী। রাজকাজে সমাজে—এমনকি সর্বত্যাগী সন্ন্যাসীদের মধ্যেও বেড়ে উঠবে পাপাচার আর অর্থলিপ্সা।"

স্বপ্নের ফলাফল শুনে ব্যথিত মনে স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন কোশলরাজ। তখন বোধিসত্ত্ব বল্লেন, "মহারাজ, আপনার ভয় পাবার বা দুশ্চিন্তা করার কোন কারণ নেই। বহুশত বছর পেরিয়ে গেলেই এসব ঘটবে—এখন নয়। ধর্মের নামে কী রকম অন্যায় অধর্ম চলে বা চলছে আপনি তা নিজেই বিচার করে দেখুন। ব্রাহ্মণ পুরোহিতেরা ধনরত্ন, পোশাক পরিচ্ছদ গরু-বাছুর আর উৎকৃষ্ট অধিক ফলনশীল ভূমিখণ্ডের লোভেই আপনাকে যজ্ঞের বিধান দিয়েছিলেন। যজ্ঞ করতে প্ররোচিত করেছিলেন। আপনার মত বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান আর শাস্ত্রজ্ঞ ধর্মপথে চলা মানুষও অন্যায় অসত্য পথে সায় দিয়েছিলেন।

আপনি যদি যজ্ঞ বন্ধ না করেন তবে অন্যায়, অধর্ম আর অসত্যই জয়ী হবে। সত্য, ধর্ম আর ন্যায়ের পথ রুদ্ধ হবে।

তখন কোশলরাজ বোধিসত্ত্বের উপদেশে যজ্ঞ বন্ধের আদেশ দিলেন। সারা দেশে সে আদেশ প্রচারিত হলো তক্ষুনি। আচার্য্য ব্রাহ্মণদের মাথায় যেন বজ্রপাত হলো।

৩৯ [] সৌমনস্য-জাতক []

অনেক অনেক দিন আগে কুরু নামে এক দেশ ছিলো। কুরু-রাজ্যের উত্তরে ছিলো এক বিশাল সমৃদ্ধ নগর। নগরের নাম পঞ্চাল। সেই নগরে রাজত্ব করতেন রাজা রেণু।

সে সময়ে মহারক্ষিত নামে একজন তপস্বী ছিলেন। তাঁর ছিলো পাঁচশো শিষ্য। হিমবন্তে থাকতেন সেই তপস্বী। একদিন তিনি তাঁর পাঁচশো শিষ্য নিয়ে লবণ, অম্ল আর তণ্ডুল ভিক্ষা করতে বেরুলেন। এসে উপস্থিত হলেন পঞ্চাল নগরে। সেখানে নগরের উপকণ্ঠে বিশাল রাজোদ্যানে আশ্রয় নিলেন তাঁরা।

একদিন আচার্য্য মহারক্ষিত রাজপ্রাসাদে গেলেন রাজদর্শন করতে। রাজা রেণু তপস্বী মহারক্ষিতের অলৌকিক বিভাময় ব্যক্তিত্বে মুগ্ধ হলেন। শ্রদ্ধানম্র চিত্তে তিনি হৃদয়ের ভক্তি-অর্ঘ্য নিবেদন করলেন সন্ন্যাসীর পায়ে মাথা ঠেকিয়ে। রাজা সোনার আসন পেতে নিজের হাতে সন্ন্যাসী মহারক্ষিতকে আদরযত্ন করে উৎকৃষ্ট খাবার দাবার খাওয়ালেন। নিজ হাতে পরিবেশন করলেন। খাওয়ার সময় তালপাতার পাখা দিয়ে বাতাস করলেন।

মহারক্ষিতের খাওয়ার শেষে রাজা নিজে সংগে করে তাঁকে আম্রকাননে নিয়ে গেলেন। মহারক্ষিত কে অনুরোধ করলেন বর্ষা-কালটা তাঁর আতিথ্যে কাটিয়ে যেতে। নির্মান করে দিতে চাইলেন উত্তম বাসগৃহ। পরিব্রাজকদের ব্যবহারে লাগে এমন সব জিনিসপত্রের যোগাড়যন্ত্র করে দেবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন।

বর্ষাকালে হিমবন্ত প্রদেশের আবহাওয়া হয়ে ওঠে খুবই জঘন্য। অস্বাস্থ্যকর। তাই সন্ন্যাসী মহারক্ষিত সাদরে গ্রহণ করলেন রাজার

প্রস্তাব। সেদিন থেকে রাজপ্রাসাদ থেকেই সন্ন্যাসীদের খাবার দাবার আসতে লাগলো। এলো পরিধেয় উত্তম আলখাল্লা।

এমনিভাবে কেটে গেলো বর্ষাকাল। হিমবন্ত প্রদেশে নিজের আশ্রমে শিষ্যসহ ফিরে যেতে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন আচার্য্য মহারক্ষিত। রাজার অশেষ গুণকীর্তন আর মঙ্গলকামনা করে বিদায় নিতে চাইলেন তিনি। অশ্রুসজল চিত্তে রাজা সম্মান সহকারে নানাবিধ উপহার সহ সন্ন্যাসীদের বিদায় জানালেন। রাজার কোন সন্তান ছিলোনা। তাই আচার্য্য মহারক্ষিতের কাছে ধর্মোপদেশ শুনে দিনগুলো তার ভালোই কেটে যাচ্ছিলো। রাজা পুনরায় বিমর্ষ হয়ে পড়লেন।

পথ চলতে চলতে পথশ্রমে ক্লান্ত-ক্ষুধার্ত সন্ন্যাসীরা এক বিরাট বটবৃক্ষের ছায়াতে বিশ্রাম নেবার জন্য থামলেন। তেষ্টার জল আর চিড়েগুড়-ফলহার করে চাঙ্গা হয়ে উঠলেন আচার্য্য মহারক্ষিত ও তাঁর শিষ্যরা। বিশ্রাম করার ফাঁকে একথা-সেকথা বলাবলি করতে করতে রাজা রেণুর আতিথেয়তার কথা উঠলো। সবাই পঞ্চমুখে প্রশংসা করলেন। দুঃখ পেলেন এই ভেবে যে রাজার কোন ছেলে নেই। কে সিংহাসনে বসবে—রাজ্য চালাবে—রাজার মৃত্যুর পরে। এসব কথা শুনতে শুনতে মহারক্ষিত ভাবলেন একবার ধ্যানযোগে জেনে নেবেন রাজার ছেলে হবে কিনা। তিনি সবাইকে শান্ত হতে বলে ধ্যানে বসলেন। ধ্যানযোগে জানলেন, খুব তাড়াতাড়ি রাজার এক ছেলে হবে। খবরটা সবাইকে দিলে সবাই খুব আনন্দিত হলো।

এদিকে একজন সন্ন্যাসী ছিলো ভণ্ড আর লোভী। সে তখনও রাজকীয় খাবারদাবার আর আদর যত্নের কথা ভুলতে পারেনি! আরাম-আয়াসে কোন কাজ না করে বেঁচে থাকার এক ফন্দী আঁটলো সেই ভণ্ড সন্ন্যাসী। সে ভাবলো রাজাকে ছেলে হবার খবর জানিয়ে হাত করে, রাজার কুলগুরু হয়ে খুঁটি গেড়ে বসবে।

যখন বিশ্রাম শেষে সবাই মিলে যাত্রার উদ্যোগ করলো তখন

সেই ভণ্ড তপস্বী অসুস্থতার ভাণ করে পড়ে রইলো। উৎকণ্ঠায় ব্যাকুল হয়ে মহারক্ষিত বল্লেন, "কি হয়েছে তোমার! অসুখ করেছে। ঠিক আছে শুয়ে থাকো তুমি। তোমার শরীর ভালো হলে তখন না হয় আমরা আবার পথ চলতে শুরু করবো। তোমাকে অসুস্থ ফেলে রেখে যাই কি করে বৎস! "না-না—প্রভু! আমার জন্য আপনাদের দেরী করতে হবেনা। আমি এখন চলতে পারছিনা। একটু বিশ্রাম নিলেই সব ঠিক হয়ে যাবে। শুধু শুধু আপনারা যাত্রা বাতিল করবেন না। আপনারা এগোন—আমি একটু সুস্থ হলেই আপনাদের পেছনে পেছনে আসবো—।" ত্রস্ত গলায় আৎকে উঠলো যেন ভণ্ড তপস্বী।

জ্ঞানী সন্ন্যাসী মহারক্ষিত এতক্ষণে সেই ভণ্ডের ধূর্ততা ধরে ফেলেছেন। বুঝলেন রাজার কাছে ভবিষ্যৎ বাণী করে বাহাদুরী নেবার আশায় রয়েছে এ কপট শিষ্য। তিনি শুধু বললেন, "তোমরা সবাই যাত্রা শুরু করো। যখন চলার শক্তি ফিরে পাবে তখন আসবে অসুস্থ তাপস—চিন্তার কিছু কারণ নেই।" মহারক্ষিত তাঁরা সব শিষ্যদের নিয়ে হিমালয়ে চলে গেলেন।

ভণ্ড তপস্বী ছুটতে ছুটতে রাজপ্রাসাদে এলো। রাজাকে তপস্বী আসার খবর পাঠানো হলো। রাজা এলেন। অবাক হলেন তপস্বীকে অবেলায় ফিরে আসতে দেখে। রাজা তপস্বীকে প্রণাম করে জিজ্ঞেস করলেন, "ভদন্ত, অন্য সব ঋষিরা ভালো আছেনতো? সব সংবাদ শুভতো? পথে কোন বিপদ হয়নিতো? আপনি এভাবে হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এলেন যে—"

"বলবো—বলবো-সব বলবো। মহারাজ, পথে আমরা সবাই এক গাছের নীচে বিশ্রাম নিচ্ছিলাম। তখন অন্য সব ঋষির বলাবলি করছিলো যে মহারাজের যদি একটি ছেলে থাকতো তবে কী সুখই হতো প্রজাদের মনে। আমি তখন ধ্যানযোগে দিব্যচক্ষু দিয়ে দেখলাম আপনার এক ছেলে হবে। এ সংবাদ আপনাকে

না জানিয়ে আমি স্থির থাকতে পারলামনা। আমি তাই ছুটতে ছুটতে এলাম। অন্য ঋষিরা এতক্ষণে অনেকদূর এগিয়ে গেছে— আমি চলি মহারাজ—অনেক দেরী হয়ে গেলো—কৃত্রিম ব্যস্ততায় আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো ভণ্ডসাধু।

এদিকে ভণ্ড সাধুর কথায় ও ব্যবহারে রাজা এত খুশী হলেন যে তিনি সাধুর হাত ধরে মিনতি করলেন, ''না—ভদন্ত—না। আমি আপনার মত দিব্য মহাপুরুষকে যেতে দেবোনা আমার কাছ থেকে। আপনাকে রোজ দর্শন করে, পুণ্য লাভ করার আনন্দ থেকে আমাকে বঞ্চিত করবেন না প্রভু। আপনি রাজগুরু হয়ে এখানেই থাকুন।

ভণ্ড তপস্বী রাজ-উদ্যানে সুন্দর অট্টালিকায় বাস করতে লাগলো। খেতে লাগলো রাজপ্রাসাদ থেকে নিয়মিত আসা সুস্বাদু রাজভোগ। দিনে দিনে পরম রূপবান আর লাবণ্যময় হয়ে উঠলো তপস্বী। লোকেরা তার চেহারার চটককে অলৌকিক বলে ভাবতো। সারা দেশে তার নাম হলো 'দিব্য-চোখ সন্ন্যাসী' বলে।

এদিকে যথাসময়ে রাজার এক ছেলে হলো। তাঁর নাম রাখা হলো 'সৌমনস্য কুমার। বোধিসত্ত্ব হলেন এই রাজপুত্র। দিনে দিনে বড় হয়ে উঠতে লাগলেন রাজপুত্র।

বোধিসত্ত্বের বয়স যখন সাত বছর—তখন রাজা যুদ্ধে গেলেন। প্রত্যন্তভাগে বিদ্রোহী প্রজাদের দমন করতে। যাবার আগে রাজা দিব্যচক্ষু সন্ন্যাসীকে বোধিসত্ত্বকে দেখাশোনার দায়িত্ব দিয়ে গেলেন।

এদিকে ভণ্ড ''দিব্য-চোখ' ধুরন্ধর ব্যবসায়ী সন্ন্যাসী। সে বসে থাকবার পাত্র ছিলোনা। আমবাগানের একদিক পরিষ্কার করে নিয়ে সে শুরু করেছিলো চাষবাস। নিজের হাতে কোদাল দিয়ে মাটি কুপিয়ে, কলসী কলসী জল এনে জল ঢেলে সে জমিকে চাষের উপযোগী করে তুলেছিলো। সেখানে সে সারাবছর ধরে নানারকম শাকসব্জী আর তরিতরকারি ফলাতো। নগরের অনেক ফলমূল

আর তরিতরকারী বিক্রেতাই তার কাছ থেকে এসব জিনিষ কিনে নিতে আসতো। দামের ব্যাপারে খুবই হিসেবী ছিলো এই ভণ্ড সন্ন্যাসী এক পয়সাও ছাড়তোনা কাউকে। এমিভাবে ফলমূল আর তরিতরকারি বেচে অনেক অর্থ জমিয়ে ফেললো 'দিব্যচোখ।'

একদিন বিকাল বেলা। রাজপুত্র ভাবলেন একবার সন্ন্যাসীকে দেখতে যাবেন। এর আগে তিনি কখনও সন্ন্যাসীর কাছে যাননি। কিন্তু তিনি অবাক হলেন সন্ন্যাসীকে দেখে। মালকোঁচা মেরে কাপড় পরে সে সব্জী ক্ষেতে জল দিচ্ছিলো তখন চাষীদের মত। কিছুক্ষণ পরেই একজন ব্যবসায়ী তরকারি কিনতে এলো নগর থেকে। দামদস্তুর নিয়ে পাকা ব্যবসায়ী লোকের মতই দরাদরি করতে লাগলো সে ব্যবসায়ীটির সঙ্গে। পরে উপযুক্ত মূল্য গুণে নিয়ে তরকারী বেচে দিলো সে। একটু আড়ালে দাঁড়িয়ে এসব ব্যাপার দেখে বোধিসত্ত্ব খুবই অবাক হলেন। বোধিসত্ত্বের মনে হলো, "এ যদি সন্ন্যাসী হয় তবে গৃহী কে?" তিনি তখন 'দিব্যচোখ' সন্ন্যাসীর সামনে এসে বললেন, "আপনি দেখছি শাকসব্জী বিক্রেতা সন্ন্যাসী। এ আপনি কি করছেন?" বোধিসত্ত্বের কথায় খুবই লজ্জা পেলো সেই দিব্যচোখ সন্ন্যাসী। মনে মনে ভাবলো, "এ বালক রাজপুত্র আমার শত্রু হয়ে দাঁড়ালো দেখছি। একে বাঁচিয়ে রাখা ঠিক হবে না। আমার সম্পর্কে বাজে ধারণা করে ফেলেছে রাজপুত্র। সে আমাকে ব্যবসায়ীদের কাছে তরকারী বেচতে ও দাম নিতে দেখে ফেলছে। এখন যদি সবাইকে বলে বেড়ায় তাহলে আমার দফারফা হয়ে যাবে। আজ থেকে রাজপুত্রকে মেরে ফেলার একটা উপায় বের করতে হবে।"

বোধিসত্ত্ব ধিক্কার দিলেন ভণ্ড সন্ন্যাসীকে। কোনো রকম সম্মান প্রদর্শনই করলো না তাকে। প্রণাম না করেই রাজপ্রাসাদে ফিরে গেলেন। তিনি মনেমনে ভাবলেন, "আমার পিতা—মহারাজা একজন পরাক্রমশালী—বিদ্বান আর প্রজাবৎসল রাজা হয়েও কি

করে এতদিন ধরে এই ভণ্ড তপস্বীর দ্বারা প্রতারিত হলেন কে জানে !"

ওদিকে ভণ্ড তপস্বী মনে মনে এক ফন্দী আঁটলো। সে রাজাকে দিয়েই রাজপুত্রকে মারার এক পরিকল্পনা করলো। রাজার বিদ্রোহ দমন করে রাজধানীতে ফেরার খবর পেয়েই সে তার ঘরের জিনিসপত্র ভেংগে চুরে, চতুর্দিকে ছড়িয়েছিটিয়ে রাখলো। পূজো করার জিনিষ-পত্র—ঘট-দুর্বা-ভাঙ্গা কলসীর কানাতে লণ্ডভণ্ড হয়ে রইলো পূজামণ্ডপ। সে নিজে গায়ে জলকাদা তেল মেখে মাটিতে শুয়ে রইলো। যেন দুঃখে শোকে সে কাতর হয়ে পড়েছে।

এদিকে রাজা নগর প্রদক্ষিণ করে রাজপ্রাসাদে না ঢুকে বিশ্রাম করে প্রথমেই এলেন গুরু 'দিব্যচোখকে' দেখতে। তাকে প্রণাম করে কুশল সংবাদ জেনে নিতো কিন্তু পূজা-মণ্ডপে ঢুকেই তিনি থমকে, দাঁড়ালেন।

"ভদন্ত। একি হাল আপনার। আপনাকে এরকম বিষণ্ণ হয়ে মাটিতে শুয়ে থাকতে দেখছি কেন? পূজামণ্ডপের এরকম অবস্থা কি করে হলো?" দিব্যচোখের পাদস্পর্শ করে রাজা করুণ আর্তনাদ করে উঠলেন।

"কি বলবো আপনাকে মহারাজ। আপনি তো অনেকদিন এখানে ছিলেন না। আপনার না থাকার সুযোগ নিয়ে রাজপুত্র তার অনুচরদের নিয়ে প্রতিদিন এখানে হামলা করেছে। আমি অহিংসার পুজারী জেনেও সবকিছু লণ্ডভণ্ড করেছে।"—বলতে বলতে কেঁদে ফেললো দিব্যচোখ।

রাগে দিশাহারা হয়ে উঠলেন রাজা। রাজপ্রাসাদে ফিরেই তিনি রাজপুত্রের হত্যার আদেশ দিলেন জল্লাদকে—"যেখানে যে অবস্থায় রাজপুত্রকে দেখবে—ঠিক সে অবস্থায় তার মাথা কেটে আনবে। তার এতদূর স্পর্দ্ধা—আমার গুরুদেবকে অপমান করে।"

জল্লাদের মুখে আদেশ শুনে কুমার সৌমনস্য জল্লাদকে বুঝিয়ে

নিজেই রাজার কাছে এসে দাঁড়ালেন। পাশেই খড়্গ হাতে জল্লাদ রইলো।

"আমার কি অপরাধ পিতা। জল্লাদ আমার মুণ্ড কাটবে এতে আমার কোন দুঃখ নেই। দুঃখ পাবো আপনি আমাকে ভুল বুঝলে মহারাজা—"

"তুমি মহাপাপী। তোমার মুখ দেখলেও পাপ হয়। না হলে আমার পূজনীয় গুরুদেব মহর্ষি দিব্যচোখকে তুমি এভাবে অপমান কর। তাঁকে সম্মান দেখানোতো দূরের কথা—উল্টো তুমি তাঁর পূজার উপাচার—মণ্ডপ-প্রাঙ্গণ লণ্ডভণ্ড করে তছনছ করে দিয়েছো—কেন? "আলু, পটল, কুমড়ো. শশা, ডাঁটা, পুঁইশাক পরিচর্যা করে যার দিন কাটে। যে চড়া দামে তরকারী বেচে ব্যবসায়ীদের কাছে। পয়সা জমানো যার লক্ষ্য—ভোগবিলাস যার একমাত্র উদ্দেশ্য তাকে গৃহী বলাতো অপরাধ নয় পিতা। আমি তো গৃহীকেই গৃহী বলেছি। যদি আমার কথা বিশ্বাস না হয় তবে বাজারের তরকারী বেচিয়ে লোকদের জিগ্যেস করুন আপনি—" রাজা বল্লেন "যদি তোমার কথা প্রমাণিত না হয় তবে এর চেয়ে আরও ভয়ংকর ভাবে প্রাণদণ্ড হবে তোমার—একথা মনে রেখো।"

নগরে তরকারি বিক্রেতাদের ডাকানো হলো রাজার আদেশে। তারা সবাই এক কথায় জানালো, ভণ্ড তপস্বীর কাছ থেকে তারা নিয়মিত তরিতরকারি কেনে চড়া দাম দিয়ে। রাজা নিজে আম্রকাননে গেলেন হঠাৎ। খুঁজে পেলেন শাক-সব্জীর ক্ষেত। আলু-পটল-বেগুনের চাষ করা হয়েছে তাও দেখলেন। সন্ন্যাসীর ঘর থেকে পাওয়া গেলো কয়েক হাজার জমানো মুদ্রার থলে।

রাজা রেগে উঠলেন দাবাগ্নির মতো। বাজপড়ার মত গর্জে উঠলেন তিনি। ভণ্ড সন্ন্যাসী 'দিব্যচোখ' রাজার প্রশ্নবানে জর্জরিত হয়ে সব অপরাধ স্বীকার করলো। রাজার আদেশে ভণ্ড সন্ন্যাসীকে পাথর ছুঁড়ে মেরে ফেললো লোকেরা। নগরের বাইরে ভাগাড়ে

ফেলে দেওয়া হলো তাকে। রাজা অনুতপ্ত হলেন। তিনি বুঝলেন বয়সে বালক হলেও বুদ্ধি-বিচক্ষণতায় কুমার অনেক প্রাজ্ঞ। তিনি নিরপরাধী। কোন অন্যায় তিনি করেননি।

কিন্তু কুমার সৌমনস্য আর সংসারে থাকতে চাইলেন না। তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। যাত্রা করলেন হিমবন্ত প্রদেশের উদ্দেশ্যে। রাজা-রানীর শত অনুরোধেও তিনি আর ফিরলেন না।

মাত্র ষোলবছর বয়সে বোধিসত্ত্ব ধ্যানবল ও মহাজ্ঞান লাভ করলেন। স্থান পেলেন ব্রহ্মলোকে।

৪০ [] মনোজ-জাতক []

অনেক অনেকদিন আগের কথা। বারাণসীতে তখন রাজত্ব করতেন রাজা ব্রহ্মদত্ত।

বোধিসত্ত্ব তখন সিংহ হয়ে জন্মেছিলেন। গুহা বাড়িতে ছিলো তাঁর স্ত্রী। এক ছেলে আর এক মেয়ে। ছেলে বড় হলে বোধিসত্ত্ব এক সিংহীর সঙ্গে তার বিয়ে দিলেন। ছেলের নাম ছিলো মনোজ। বোধিসত্ত্বের ছেলে মনোজই সংসারের পাঁচটি প্রাণীব ভরনপোষণ করতো। বুনো মোষ, শূয়র, গরু, ভেড়া আর হরিণের মাংস খেয়েই দিন কাটতো ওদের। মনোজ ছিলো বন্যপ্রাণী শিকারে দক্ষ। বোধিসত্ত্ব তখন হয়ে পড়েছিলেন বৃদ্ধ। তাই ছেলে মনোজই ছিলো তাঁর বল ভরসা আর আশ্রয়।

প্রতিদিনের মত সেদিনও খুব ভোরে মনোজ শিকারের আশায় এক জলাভূমিতে ওৎপেতে বসেছিলো। কিন্তু কোন শিকার না। মেলাতে ফেরার পথ ধরতেই ছোট্ট পথে এক শৃগাল শুয়ে আছে দেখতে পেলো। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। শৃগালটা পালাতে না পেরে, উপায় না দেখেই মাটিতে শুয়েছিলো। সেই শৃগালকে

সবাই 'গেরুয়া' বলে ডাকতো। সে ছিল মহা ধূর্ত আর মিটমিটে শয়তান। কিন্তু মুখের কথা ছিলো মধুমাখানো। শৃগাল—'গেরুয়া' বিনয়ের অবতার হয়ে করজোড়ে মিনতি করলো, "প্রভু, আমার প্রাতঃপ্রণাম নিন। আজ আমার কি সৌভাগ্য—চোখ মেলেই আপনাকে দেখলাম। আজকের দিন খুব ভালো যাবে। যদি অপরাধ না নেন—তবে আমি সব সময় আপনার পাশে পাশে থেকে আপনার সেবা করতে ইচ্ছা করি—।" শৃগালের কথা শুনে মনোজ গলে গেলো। সে ভারিক্কি চালে বললো, "ঠিক আছে—এ আর বেশী কথা কি? আজ এখন থেকেই বন্ধুর মত তুমি আমার সঙ্গে থাকবে। চলো শিকার করা যাক কিছু—।" মনোজ শেয়াল 'গেরুয়া'কে সংগে নিয়ে শিকারের উদ্দেশ্যে হ্রদের দিকে চললো।

বেশ বড়সড় গোছের একটা মোষ মারলো। মৃত মোষকে কাঁধে করে শৃগালকে সংগে নিয়ে গুহা-বাড়িতে ফিরলো সে।

বাসগুহাতে শৃগালকে সংগে করে নিয়ে আসাতে খুবই অবাক হলেন বোধিসত্ত্ব ও অন্যান্য সবাই। মনোজ জানালো, আজ থেকে শৃগাল 'গেরুয়া' আমাদের পরিবারের একজন হয়ে আমাদের গুহাতেই থাকবে।"

শৃগাল গেরুয়া চান করতে গেলো। একলা পেয়ে বোধিসত্ত্ব মনোজকে বল্লেন, "বাবা মনোজ আমি বুড়ো হয়েছি। তোমার চেয়ে সংসারকে আমি অনেক বেশী দেখেছি। চিনেছি। জেনেছি। তাই বলছি—শৃগালেরা অসৎ কাজ করতে লজ্জিত হয় না। এদের কৃতজ্ঞতা জ্ঞান নেই বল্লেই চলে। এরা যার খাবে তারই ক্ষতি করবে। তাই তুমি এদের কাছ থেকে দূরে থাকলেই তোমার মঙ্গল হবে। এরা লোককে কু-পরামর্শ দিতে ওস্তাদ। ভালো করবেনা কখনও মনোজ—।" মনোজ বোধিসত্ত্বের কথা চুপ করে শুধু শুনলো কিন্তু এক কান দিয়ে শুনে আর এক কান দিয়ে বের করে দিলো সে কথা।

গেরুয়া আর মনোজ শিকারে বেরিয়েছে। ঘুরতে ঘুরতে দু'জনে মিলে ঘন বনের শেষ সীমানায় চলে এলো। এর কিছু পরেই নগরের বাইরের দিকের সীমানার শুরু। বাড়িঘর—লোকজনও চোখে পড়ে সেখান থেকে। শয়তান গেরুয়ার মাথায় তখন এক মতলব খেলে গেলো। গেরুয়া একবার তার জ্যাঠার কাছে শুনেছিলো যে মানুষেরা যে ঘোড়ার পিঠে চড়ে, কিন্তু খায়না—সেই ঘোড়ার মাংস খেতে নাকি দারুণ সুস্বাদু। অপূর্ব। শৃগাল গেরুয়ার জিভে জল এলো সে কথা ভেবেই। সে বললো উদাসী গলায়' "বন্ধু-মনোজ, অনেকদিন থেকে একটা জিনিস খাওয়ার লোভ হচ্ছিলো—কিন্তু সে সাধ আর পূরণ হবেনা কোনদিন। আমি কোনদিন ঘোড়ার মাংস খাইনি। শুনেছি অপূর্ব খেতে। চলোনা, দুজনে মিলে একটা ঘোড়া ধরে আনি মানুষের খপ্পর থেকে।" বলতে বলতে সে আড়চোখে মনোজকে দেখতে লাগলো। গেরুয়ার কথাতে খুবই উৎসাহিত হয়ে পড়লো মনোজ।—"তাই নাকি। তুমি আমাকে আগে বলবে তো সে কথা। এটা একটা ব্যাপার হলো। ঘোড়া মারাতো ছেলেখেলা আমার কাছে। আমার নাম শুনে বাঘেরা পথ ছেড়ে ভয়ে পালায়—তা কোথায় পাবো ঘোড়ার দেখা? জঙ্গলে তো ঘোড়া দেখতে পাইনা গেরুয়া?"

জঙ্গলে ঘোড়া দেখবে না তো। মানুষেরা একরকম দড়ির ফাঁস দিয়ে বুনো ঘোড়া ধরে নিয়ে পোষ মানিয়ে পিঠে চড়ে। তাই জঙ্গলের ঘোড়া সাফ হয়ে গেছে। ঘোড়া পাবে তুমি সামনের এ রাস্তা ধরে বেশ খানিকটা গেলে পরে। রাস্তার ধারে বারাণসী নগরের বাইরে বিরাট এক নদী রয়েছে। সেই নদীর ঘাটে ঘোড়ার পালকে চান করাতে নিয়ে আসে ঘোড়ার-চাকরেরা। অবশ্য সে সবই ইয়া ইয়া—মস্তবড় চেহারার রাজার ঘোড়া। দারুণ তাগড়া। মাংস যা জমবেনা—" কথা শেষ না করেই সুড়ুৎ করে নোলার জল টেনে নিলো গেরুয়া।

সুশ্রী সিংহযুবক মনোজ, কুশ্রী কুটিল শৃগাল যুবক গেরুয়ার কথাই শুনলো। দুপুরে বারানসীর নদীর ঘাটে ঘোড়াদের দলাইমালাই করে চান করাচ্ছিল সহিসেরা। হঠাৎ-ই ভয়ংকর বাজপড়ার শব্দ হলো। ঘোড়াদের সামনে লাফিয়ে পড়লো মনোজ। সিংহের গর্জন আর ভয়াল চেহারা দেখেই দাঁত কপাটি লেগে গেলো সহিসদের। মনোজ সবচেয়ে ডাগড়া চেহারার ঘোড়াটাকে এক থাবাতেই ঘাড় ভেংগে ফেললো। পরে পিঠে তুলে নিয়ে নিমেষেই হাওয়া হলো সেখান থেকে। গেরুয়া অবশ্য দূর থেকেই ব্যাপারটা দেখছিলো তখন সাহসের সঙ্গে।

মনোজের গুহা-বাড়িতে খুশী হয়েই সবাই পেট পুরে তাজা ঘোড়ার মাংস খেলো। কিন্তু মনোজের বাবা বোধিসত্ব খুশী হতে পারলেন না। তিনি মনোজকে ডেকে বললেন, "বাবা, মনোজ— একটা কথা তোমাকে আলাদাভাবে বলবো বলে ডেকেছি। ঘোড়ার মাংস খেতে খুবই ভালো সন্দেহ নেই। তবেকি জানো, ঘোড়ারা হলো মানুষের জন্য—রাজভোগ্য। তাই রাজাকে শত্রু করে চটিয়ে দিয়ে জঙ্গলের কোন প্রাণীই বেশীদিন বাঁচতে পারবেনা। রাজার অধীনে রয়েছে দক্ষ সব তীরন্দাজ। এদের লক্ষ কখনও ফস্‌কায়না। বিষমাখানো লোহার ধারালো তীরের ফলার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ঘোড়া মারতে যাওয়াটা খুবই বোকামো হবে। তাই আমার অনুরোধ—বাবা মনোজ আজ থেকে তুমি আর ঘোড়ার মাংস খেতে লোভ করোনা। ঘোড়ার মাংস খেয়ে কোন সিংহই বেশীদিন বেঁচে থাকেনা। রাজার তীরন্দাজের হাতেই তাদের মৃত্যু হয়।"

যথারীতি বাবার কথা মনোজ এককান দিয়ে শুনলো। অন্য কান দিয়ে বের করলো। শুনলোনা বোধিসত্ত্বের সাবধানবাণী।

প্রত্যেকদিনই একটা করে রাজার পালিত ঘোড়া মারতে লাগলো মনোজ। রাজার সৌখিন আস্তাবল থেকে সিংহ ঘোড়া

মেরে ফেলেছে শুনে রাজা নগরের ভেতরেই পুকুর কাটালেন। সেই পুকুরেই ঘোড়াদের চান করানো চললো। কিন্তু নগরের উঁচু পাঁচিল পেরিয়ে চতুর আর সাহসী মনোজ রাজার নতুন অশ্বশালা থেকেই ঘোড়া-শিকার করে চললো প্রায়, প্রতিদিন। কিছুতেই মনোজকে দমানো গেলোনা।

রাজা তখন একজন দক্ষ শিকারীকে ডাকালেন। আদেশ করলেন ঘোড়া-চোর সিংহকে খতম করে দিতে। শিকারীটি ছিলো ধনুকবাণে সিদ্ধহস্ত। বিদ্যুতের গতিতে নির্ভুল লক্ষ্যে তীর ছুঁড়ে মাছি গাঁথতে পারতো সে।

মনোজের আসাযাওয়ার পথের ধারে ঘোড়ার আস্তাবলের কাছাকাছি মাচা তৈরি হলো। সেখান থেকে নগর পাঁচিলের ওপরে নজর রাখা চলে। তীরন্দাজ শিকারী মাচার ওপর ওৎপেতে বসে রইলো মনোজকে মারতে। মনোজ এখন গভীর রাতেই নগরের পাঁচিল টপকে নগরে ঢুকতো। অশ্বশালা থেকে ঘোড়া মেরে পিঠে করে নিয়ে লাফিয়ে বিদ্যুতের বেগে পাঁচিল টপকে বেরিয়ে যেতো। নগরের বাইরের এক পরিত্যাক্ত শ্মশানে মনোজের জন্য অপেক্ষা করতো গেরুয়া। মনোজ ঘোড়া মেরে আনার পর দুজনে মিলে গুহাবাড়িতে ফিরতো।

এভাবেই চলছিলো বেশ। কিন্তু একদিন অমাবস্যার রাতে চতুর শিকারী দেখলো মনোজ পাঁচিল টপকে নগরে ঢুকলো। সে তীর ছুঁড়লোনা। সে জানতো ঢোকার সময় সিংহের গতি হয় দ্রুততম। মনোজ কোন বাধা পেলোনা। আস্তাবলে ঢুকে নধরকান্তি এক বাদামী ঘোড়াকে মেরে পিঠে চাপিয়ে যেইনা পাঁচিল টপকাতে গেলো সে মুহূর্তেই শিকারীর তীর তার গলাতে লাগলো। সিংহ মরণ যন্ত্রণাতে গর্জ্জন করে উঠলো—"গেরুয়া—আমার তীর লেগেছে—শীগ্‌গীর এসো ভাই—মরে গেলাম—।" কিন্তু শৃগাল গেরুয়ার কাছ থেকে সে কোন উত্তর পেলোনা। তখন প্রাণপণ

শক্তিতে মনোজ ঘোড়াটাকে পিঠে বহন করে এনে কোনরকমে নিজের গুহাবাড়ির উঠানে এলো। কিন্তু ফিরে এসেই যে মাটিতে শুয়ে পড়লো আর উঠলোনা।

ওদিকে শৃগাল গেরুয়া ধনুকের টঙ্কার আর মনোজের করুণ সিংহনাদ শুনতে পেয়েছিলো অনেক আগেই কিন্তু ধূর্ত শৃগাল ভাবলো, ''মনোজ নির্ঘাৎ তীর খেয়েছে। বাঁচবে বলে মনে হয় না। আমার আর ওখানে গিয়ে ঝামেলা বাড়িয়ে লাভ কি? বেশ হয়েছে। আর ঘোড়ার মাংস খাওয়ার লোভ করোনা—এখন ঠ্যালা বোঝ—আমি জঙ্গলে কেটে পড়ি বাবা। প্রাণে বাঁচলে ওরকম নতুন বন্ধু অনেক জুটবে পরে আমার—" হাসতে হাসতে বন্ধুকে বিপদের মুখে ফেলে রেখে হেলতে দুলতে চলে গেলো গেরুয়া শৃগাল।

একনদী রক্তের মধ্যে মরে কাঠ হয়ে গুহাবাড়ির উঠানে পড়ে রইলো যুবক সিংহ। মনোজের এ অকাল মৃত্যুতে শোকে পাথর হয়ে গেলো তার মা, বাবা, বোন আর স্ত্রী। একে একে জমায়েত হলো শোকার্ত আত্মীয়রা।

বোধিসত্ত্ব স্বর্গতোক্তির গলায় কোনরকমে উচ্চারণ করলেন, "মনোজরে—বাপ আমার—নিষেধ শুনলিনা। পাপী বন্ধুর সংগে মেলামেশা করে অকালে প্রাণ দিলি বাপ!' তোকে বিপদের মুখে ঠেলে দিয়ে পালিয়ে গেলোরে সেই শয়তান শৃগাল—বন্ধু চিনলিনারে বাপ আমার—"

সৎ লোকের অসৎ বন্ধু জুটলে তার দুর্দশার শেষ নেই। যে কোন মুহূর্তে অধমবন্ধুর প্ররোচনায় প্রাণ যেতে পারে। কখনও অপাত্রে বন্ধুত্ব করতে নেই।

৪১ [] সুতনু জাতক []

অনেক অনেক দিন আগের কথা।

বারাণসীতে তখন রাজা ব্রহ্মদত্ত রাজত্ব করতেন।

তখন বোধিসত্ত্বের নাম ছিলো সুতনু। এক গরীব দিন মজুরের ঘরে জন্মেছিলেন তিনি। তাঁর তখন খুবই ছোটবেলা। অতিরিক্ত পরিশ্রমে ঘরামীর কাজ করার সময় মারা গেলেন তাঁর বাবা। বিধবা মা লোকের বাড়িতে কাজ করে সুতনুকে বড় করে তুললেন অতি কষ্টে আধপেটা খেয়ে।

বড় হয়ে বোধিসত্ত্ব বিধবা-রুগ্না মাকে বিশ্রাম নিতে বল্লেন। নিজেই মজুরের কাজ করে সংসার চালাতে লাগলেন। মোটা ভাত আর মোটা কাপড়, শনের চালা—মাটির ঘরে কোন রকমে শান্তিতেই কেটে যাচ্ছিলো বোধিসত্ত্বের দিনকাল।

রাজা ব্রহ্মদত্তের ছিলো শিকারের নেশা। অনেক লোকলস্কর নিয়ে তিনি প্রায়ই শিকার করতে বেরুতেন। একদিনের ঘটনা। রাজা মৃগয়া করতে বেরিয়েছেন। নগরের বাইরে এক অরণ্যের প্রান্তে তাঁবু ফেলেছেন। ঘোড়ায় চড়ে জঙ্গলে ঢুকলেন তিনি অনুচরসহ। অনুচরেরা ঢাকঢোল পিটে মুখে নানারকম চীৎকার করে রাজার দিকে বন্যপশুদের খেদিয়ে আনতো—রাজা তখন সানন্দে শিকার করতেন।

এদিকে হলো কি—একটা দুর্লভ জাতের চিতল হরিণ দেখে রাজা পিছু নিলেন। অনেকদূর তাড়া করে শেষে হরিণটাকে তীর মারতে পারলেন। হরিণটা ছিলো ভীষণ ধড়িবাজ। সে ভান করলো যে তীরের আঘাতে যেন সে মারা যেতে বসেছে। মাটিতে

শুয়ে পড়ে ছটফট করতে লাগলো হরিণটা। কিন্তু রাজা যেইমাত্র ঘোড়া থেকে নেমে ধরতে যাবেন—সে মুহূর্তেই তীরের বেগে ছুটে পালালো সে। রাজাও দমবার পাত্র নন। তিনিও ধারালো খড়্গ হাতে করে পেছনে ধাওয়া করলেন হরিণটার।

অবশেষে রাজারই জিৎ হলো। একসময় দৌড়তে দৌড়তে ক্লান্ত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো হরিণটা। মুখ দিয়ে ফেনা গড়িয়ে যেতে লাগলো। রাজা অনয়াসে ধরে ফেল্লেন হরিণটাকে। ধারালো খড়্গ দিয়ে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেল্লেন হরিণটাকে পরে হরিণের টুকরো করা মাংস গাছের ডালের ছ'দিকে বেঁধে ঝুলিয়ে নিয়ে চল্লেন কাঁধে করে।

যেতে যেতে ক্লান্ত হয়ে পড়লেন রাজা। বিশ্রামের জন্য থামলেন। ঝাঁকড়া মাথা এক বটগাছের নীচে শুয়ে পড়লেন তিনি। ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লেন গভীরভাবে। অনেকদিন এতো আরাম করে ঘুমোননি তিনি।

এদিকে ওই বটগাছে থাকতো এক যক্ষ। নাম তার মহাদেব। খাদেব রাজার মাংস খেতে পাবে বলে খুশী হল। রাজা ঘুম থেকে মাংস কাঁধে নিয়ে যাওয়ার উপক্রম করতেই যক্ষ রাজার সামনে এসে দাঁড়ালো। হাত ধরে টানলো রাজাকে। "দাঁড়াও—আমার কাছ থেকে যাওয়ার আর উপায় নেই তোমার। তোমাকে খাবো আমি।" "তুমি কে? সাহসতো কম নয় তোমার? আমার পথ আটকাও—" "আমি যক্ষ। এই গাছে থাকি। এই গাছের নীচে যে আসবে তাকেই খেতে পারি আমি। কেউ বাধা দেওয়ার নেই আমাকে ধর্মত—"

"আজই খেলে চলবে, না—রোজ রোজ খেতে হবে তোমাকে?" সাহসে বুক বেঁধে রাজা প্রশ্ন করলেন যক্ষকে।

"রোজ পেলে রোজ খাবো। আজ তোমাকে পেয়েছি—এখন তোমাকে খাবো আমি।"

"তবে এক কাজ করো। আজ এই হরিণের সুস্বাদু মাংস খাও। আমাকে ছেড়ে দাও। আমি কথা দিচ্ছি, রোজ তোমার ভাত দিয়ে একজন লোককে তোমার এখানে পাঠাবো আমি।"

"বেশ, তোমাকে ছেড়ে দিলাম। কিন্তু সাবধান কথার খেলাপ যেন না হয়। তাহলে পালিয়ে পার পাবেনা। আমি যেদিন ভাতসহ লোক খেতে পাবোনা সেদিনই তোমাকে খাবো কিন্তু—"

"আমি বারাণসীর রাজা। আমার কথার নড়চড় হয়না। আমি অসাধ্য সাধন করতে পারি।" রাজা প্রতিজ্ঞা করলেন। যক্ষ রাজাকে ছেড়ে দিয়ে হরিণের মাংস খেতে লাগলো।

রাজা রাজধানীতে ফিরে গেলেন। মহামন্ত্রীকে সব কথা খুলে বললেন। যক্ষের সব কথা শুনে চিন্তিত হলেন মহামন্ত্রী। "কতদিন ধরে আপনি যক্ষকে ভাত দিয়ে লোক পাঠাবেন; একথা না বলাটা বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ালো। তবে ভাববেন না—জেলখানাতে অনেক বন্দী রয়েছে। কাজ নেই কম্মো নেই, ভাত ধ্বংস করে চলেছে—এখন থেকে রোজ একজন বন্দীকে ভাত দিয়ে যক্ষের কাছে পাঠাবো। তাহলেই ল্যাঠা চুকে যাবে। আপনি নিশ্চিন্ত হোন মহারাজ। আমি এসব দেখবো। মহামন্ত্রীর কথাশুনে রাজা অনেকটা আশ্বস্ত হলেন।

প্রতিদিন বটগাছের তলাতে একজন করে বন্দী যক্ষের ভাত নিয়ে যেতো। লোকগুলো কেউ জানতেও পারতোনা তারা খুন হতে চলেছে। যক্ষ প্রথমে ভাত খেতো। পরে মানুষ খেতো আয়েশ করে। এভাবে বিনা পরিশ্রমে ভাত, আর মানুষ খেয়ে আর আনন্দে গান গেয়ে দিন কাটিয়ে দিতে লাগলো যক্ষ।

এদিকে দেখতে দেখতে জেলখানার সব বন্দী ফুরিয়ে গেলো। সবাই গেলো যক্ষের পেটে। আর কেউ রইলোনা যে যক্ষের কাছে ভাত নিয়ে যায়। চিন্তায় চিন্তায় কালিবর্ণ হলো রাজার চোখ মুখ প্রাণের ভয়ে খাওয়া দাওয়া আর ঘুম গেলো ছুটে। কিন্তু এ রকম

বিপদেও দমলেননা মহামন্ত্রী। ঠাণ্ডা মাথায় কি যেন ভেবে নিলেন। রাজাকে বল্লেন, চিন্তা না করতে। তবুও মরণভয়ে কাঁপতে কাঁপতে অজ্ঞান হয়ে গেলেন রাজা। চোখে-মুখে জল দিয়ে আর বৈদ্যের বলকারক তেজী ওষুধ খাইয়ে জ্ঞান ফিরিয়ে আনা হলো রাজার। তখন মহামন্ত্রী গোপন পরামর্শ করতে রাজার মন্ত্রণা কক্ষে ঢুকলেন রাজাকে সংগে নিয়ে। রাজাকে আসনে বসিয়ে মহামন্ত্রী বল্লেন, "আমার মাথায় এক বুদ্ধি এসেছে। অর্থ বল মহা বল। অর্থে কী না হয়। রাজহাতীর পিঠে রূপোর ঝুড়িতে কয়েক হাজার মুদ্রা চাপিয়ে সারা শহরে ঢোল শহরৎ করে দিতে হবে। যে লোক ভাত নিয়ে স্বেচ্ছায় যক্ষের কাছে যাবে—তাকে এ সব মুদ্রা পুরস্কার দেওয়া হবে রাজার তরফ থেকে।" মন্ত্রীর পরামর্শ রাজার মনে ধরলো।

রাজার আদেশে সারা রাজ্যে ঢোল পিটিয়ে প্রচার করে দেওয়া হলো সে ব্যাপারে। ততদিনে সারা দেশের লোকই যক্ষের ব্যাপার জেনে গেছে। ভয়ে সবারই মুখ চূন। প্রাণ পাখি খাঁচা ছাড়া হবার উপক্রম।

বোধিসত্ত্ব তখন একজনের বাগান পরিষ্কার করছিলেন নিড়ানি দিয়ে। রাজার ঘোষণা শুনে তিনি মনে মনে স্থির করলেন, "লোকের বাড়িতে কামিনের কাজ করে আধপেটা খেয়ে কোন রকমে বেঁচে আছি। আমার মাকে একটা ভালো কাপড় কিনে দিতে পারিনি কখনও। পারিনি একটু ভালো মিষ্টি, ফলমূল কিনে খাওয়াতে। সারা জীবন কষ্টের ঘানি টেনেই গেলেন তিনি। আমি যক্ষের কাছে যাবো। বিনিময়ে হাজার মুদ্রা মাকে দিয়ে যাবো। তাহলে যতদিন বেঁচে থাকবেন স্বচ্ছলভাবে ভালো খেয়ে পরে বেঁচে থাকতে পারবেন তিনি। আর কষ্ট করতে হবেনা তাঁকে।"

বোধিসত্ত্ব মাকে সব খুলে বল্লেন। কিন্তু বোধিসত্ত্বের মমতাময়ী মা পৃথিবীর সমস্ত অর্থের বিনিময়েও তাঁর একমাত্র ছেলেকে যক্ষের কাছে যেতে দিতে রাজী হলেননা কিছুতেই। বোধিসত্ত্ব অনেক

করে বোঝালেন তবুও তাঁর মা মত দিলেন না যক্ষের কাছে যেতে।

তখন বোধিসত্ত্ব মায়ের অনুমতি না নিয়েই রাজপুরুষদের কাছ থেকে প্রাপ্য অর্থ নিয়ে কথা দিলেন যে তিনি সর্তমত নির্দিষ্ট সময়ে যক্ষকে ভাত পৌঁছে দিতে যাবেন। তিনি মাকে সব অর্থ দিয়ে বল্লেন, "তুমি আমাকে আশীর্বাদ করো মা। আমি যক্ষকে দমন করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তোমার কাছে ফিরে আসবো। তুমি কিচ্ছু ভেবোনা মা—" মাকে প্রণাম করে তিনি রাজপুরুষদের সংগে গেলেন রাজার কাছে। রাজা জিগ্যেস করলেন, "কি নাম তোমার? কি করো তুমি? যক্ষের কাছে যেতে রাজী আছোতো? সব শুনেছোতো?"

"মহারাজ, আমার নাম সুতনু। আমি দিনমজুর খাটি। বাবা নেই। মা আছেন। মাকে সুখে রাখতে চাই। তাই সহস্র মুদ্রার জন্য স্বেচ্ছায় যক্ষের কাছে যেতে চাইছি।"

"বেশ! ভালো কথা। এখন কি কি লাগবে তোমার বলো?

"মহারাজ, আপনার সোনার কারুকাজ করা হরিণের চামড়ার জুতোটা চাই।"

"জুতো দিয়ে কি করবে হে তুমি? লড়াই করবে নাকি?"

"আজ্ঞে, যক্ষের শুধু মাটিতে অধিকার। আমি তাই জুতো পায়ে দাঁড়াবো। কখন ও মাটিতে পা রাখবো না খালিপায়ে।"

"আর কি চাও বল আমাকে?"

"আজ্ঞে—মহারাজ, আপনার সোনার ছাতাটা চাই।"

"ছাতা দিয়ে কি করবে?"

"আজ্ঞে, বৃক্ষের ছায়ায় দাঁড়ালেই যক্ষ আমাকে খেতে চাইতে পারে—কিন্তু ছাতা মাথায় দাঁড়ালে বৃক্ষের ছায়া পড়বেনা।"

"ঠিক আছে। ছাতা পাবে। আর কি চাও?"

"আপনার প্রিয় খড়্গটা চাই আমার। আর একখানা ভালো তরবারি।"

"খড়গ দিয়ে কি হবে ? খড়গ দিয়ে যক্ষ মারা সহজ নয় –।"

"জানি তা মহারাজ। তবুও খড়গ আর তলোয়ার দেখে কিছুটা ডরাবে যক্ষ।"

"আর কি চাই তোমার ?"

"যে সোনার থালায় আপনি ভাত খান, যে থালাতে মণিমুক্ত ঝলসায়—তাতে উৎকৃষ্ট রাজকীয় খাবার দাবার ভর্তি করে থালাখানা আমাকে দিতে হবে কিন্তু মহারাজ।"

"সোনার থালার কি দরকার ? মাটির বাসনইতো যথেষ্ট তোমার মত লোকের জন্য—কি বল ?"

"না মহারাজ। আমার ন্যায় পণ্ডিত মানুষের মাটির থালা নিয়ে যাওয়াটা মোটেই মানায়না।

"বেশ। তুমি যা চাইলে সবই পাবে।"

রাজার আদেশে একজন লোক বোধিসত্ত্বের সংগে চললো জিনিষ-পত্র বহন করে।

বোধিসত্ত্ব রাজাকে প্রণাম করে বল্লেন, "মহারাজ, ভাববেননা। কোন ভয় নেই। আমি আজ যক্ষকে দমন করে আপনাকে চিন্তামুক্ত করবো।

বোধিসত্ত্ব যক্ষের ব্যসস্থানের কাছাকাছি এসেই নিজে স্বুবর্ণ জুতো পরলেন। কটিতে তরবারি বাঁধলেন। মাথার ওপরে ছাতা ধরলেন। সোনার থালার অন্নব্যঞ্জন সহ যক্ষের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন।

এদিকে যক্ষর খুব ক্ষুধা পেয়েছিলো। সে অনেকক্ষণ ধরে পথের দিকে তাকিয়েছিলো। বোধিসত্ত্বকে সাহসের সঙ্গে অদ্ভুত বেশভূষায় এগিয়ে আসতে দেখে খুবই বিস্মিত হলো আরও অবাক হলো, যখন ছাতামাথায় বোধিসত্ত্ব গাছের ছায়ায় না দাঁড়িয়ে, তরবারি দিয়ে ঠেলে ভাতের থালাটা যক্ষের কাছে এগিয়ে দিলো।

যক্ষ তখন চেঁচিয়ে বললো, "নিজের হাতে থালা নিয়ে খালি পায়ে হেঁটে গাছের ঠাণ্ডা ছায়াতে এসোনা কেন। আমার হবে

তোমার। আর আমিও রাজার প্রতিজ্ঞামত ভাত আর তোমাকে খেতে পারবো।"

"আমাকে খেলে কেউ আর ভাত নিয়ে আসবেনা তোমার কাছে। তাছাড়া আমাকে খাওয়ার কোন অধিকারও তোমার নেই। আমি মাটিতে দাঁড়াইনি। বটের ছায়াতে ও দাঁড়াইনি। তুমি খুশী মনে ভাত-তরকারি খাও। আমাকেও যেতে দাও।"

বোধিসত্ত্বের কথা শুনে খুশী হল যক্ষ। যে তাঁকে সোনার থালা, খড়গ, ছাতা নিয়ে বাড়ি যেয়ে বিধবা মাকে সেবাযত্ন করতে বললো।

কিন্তু বোধিসত্ত্ব যক্ষকে উপদেশ দিলেন। ধর্মে মতি আনলেন ফিরিয়ে। যক্ষকে ভালোভাবে সৎভাবে বেঁচে থেকে পুণ্যফল সঞ্চয় করতে বললেন। বোধিসত্ত্বের কথা শুনে যক্ষের চৈতন্য ফিরলো।

তখন বোধিসত্ত্ব বললেন, "যক্ষ, বনে থেকে কী লাভ হবে তোমার? তার চেয়ে আমার সংগে নগরে চলো। সেখানে তুমি ভালো করে থাকবে। ভালো খাবার দাবার পাবে। শুধু জীব হত্যা করতে পারবেনা। তুমি যাতে আরামে দিন কাটাতে পারো তার সবকিছুর ভার আমি নিলাম—"

বোধিসত্ত্ব যক্ষকে সংগে নিয়ে বারাণসীতে ফিরলেন। যক্ষ বোধিসত্ত্বের ছাতা, খড়গ, তরবারি, সোনার অন্নপাত্র বয়ে আনলো পেছন পেছন। রাজা ও মন্ত্রীরা খুশীমনে নগরে "যক্ষের থাকা ওখাওয়ার বন্দোবস্ত করে দিলেন।

৪২ [] সিংহচর্ম-জাতক []

বোধিসত্ত্ব ছিলেন চাষীর ছেলে। গরীব চাষী। সামান্য যা কিছু জমিজমা ছিলো—সেটা চাষবাস করে অতিকষ্টে দিন চলতো তাঁর। তাতেও সারা বছরের খাবার হতো না। টান পড়তো ধান-চালে। ধারের ওপর আরও ধার করে বেঁচে থাকতে হতো তাঁকে।

তখন দেশে রাজা ছিলেন ব্রহ্মদত্ত। সে সময়ে বারাণসীতে ছিলো এক বণিক। সে ছিল মহা ধুরন্ধর। কূটবুদ্ধিতে তার চেয়ে ওস্তাদ কেউ ছিলো কিনা সন্দেহ। তাঁর ছিলো এক গাধা। সে নানা রকম পণ্য বোঝাই করে সেই গাধার পিঠে চাপিয়ে শহরে গ্রামে-গঞ্জে-হাটে ঘুরে ঘুরে বিক্রি করতো।

সে যখনই কোথায়ও সুবিধে হতো সেখানেই গাধার পিঠ থেকে মালপত্র নামিয়ে গাধাকে সিংহের চামড়া পরিয়ে দিয়ে লোকের ধান, যব, আলু, মটর, বেগুন, উচ্ছের খেতে ছেড়ে দিতো। জমির মালিকেরা দূর থেকে সিংহের চামড়া পরা হৃষ্টপুষ্ট গাধাকে দেখে সিংহ ভাবতো। মারাতো, দূরের কথা ভয়ে পালিয়ে যেতো তারা দূর থেকেই। এদিকে লোকেরা ভয়ে পালিয়ে গেলে ধূর্ত বণিক তাড়াহুড়ো করে ক্ষেতের মধ্যে নেমে ফসল সংগ্রহ করতো ঝোলায় ভরে। এমনিভাবে ফলাও ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছিলো সে অনেকদিন ধরে।

এদিকে ঘুরতে ঘুরতে বণিক তার গাধা নিয়ে বোধিসত্ত্বের গ্রামে এসে উপস্থিত হলো। গ্রামের এক নির্জন প্রান্তে ডমুর গাছের নীচে আস্তানা গাড়লো সে। দুপুর বেলা হতে সে গাধাকে ছেড়ে দিলো সিংহের চামড়া পরিয়ে দিয়ে। ভাবলো এখন কাছে পিঠে লোকজন

কেউ আর থাকবে না মাঠের মধ্যে। সে নিজে রান্নাবান্না করতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো মাটির ঢেলার তৈরী উনোনে।

এদিকে চাষী বোধিসত্ত্ব তখনও বাড়ি না ফিরে নিড়ানি দিয়ে জমি পরিষ্কার করছিলো। দূর থেকে সিংহের চামড়াপরা গাধার চলাফেরা দেখেই সন্দেহ হলো তার। গাধাটা তখন যবের ক্ষেতে পরম আনন্দে চরে বেড়াচ্ছিলো। যতনা খাচ্ছিলো তার চেয়ে বেশী তছনছ করছিলো পা দিয়ে। তবুও ঝুঁকি না নিয়ে তিনি দৌড়ে গ্রামের ভেতরে গেলেন। সবাইকে প্রস্তুত হতে বললেন। ক্ষেতে সিংহ পড়েছে—তাড়াতে হবে।

গ্রামের সবাই লাঠি বল্লম, সড়কি, তীর-ধনুক নিয়ে শঙ্খ আর ভেরী বাজাতে বাজাতে চললো। গাধা দূর থেকে এত লোকজন আর আওয়াজ শুনে ভীষণ ভয় পেয়ে গেলো। ভড়কে গিয়ে গাধা তারস্বরে চীৎকার করে উঠলো।

আর গাধার ডাক শুনে চমকে উঠলো গ্রামের লোকেরা। তারা ভাবনায় পড়ে গেলো জন্তুটা কী হতে পারে ভেবে। ডাকছে গাধার মত, অথচ দেখতে সিংহের মত—ব্যাপার কি? সবাই উত্তরের আশায় বোধিসত্ত্বের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো। বোধিসত্ত্ব হঠাৎ-ই হোহো শব্দে জোরে হেসে উঠলেন। বল্লেন, "বোকা গাধাটাকে কেউ সিংহের চামড়া পরিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। আর গাধাটা তাতেই নিজেকে সিংহ ভাবতে শুরু করেছে। তছনছ করে দিচ্ছে ধানের ক্ষেত। আলু-পটল-শসা। আর লঙ্কা। চলো সবাই মিলে মজা বুঝিয়ে-দিই বোকা গাধাকে।"

বোধিসত্ত্বের কথায় সবাই সাহস ফিরে পেলো। হৈ-হৈ করে ঘিরে ফেললো গাধাকে। পিটিয়ে হাড়গোড় ভেংগে ফেললো। মরণডাক ডাকতে ডাকতে গাধা আধ মরা হয়ে পড়ে রইলো যবের ক্ষেতে। বোধিসত্ত্ব আগে ভাগেই গাধার গা থেকে মূল্যবান সিংহের

চামড়াটা খুলে নিয়েছিলেন। দূর থেকে গাধার মরণ চীৎকার শুনে বণিক বুঝলো গাধার মরণ ঘনিয়ে এসেছে।

এদিকে সবাই চলে গেলে চুপিচুপি মৃত গাধার কাছে এলো সেই বণিক। ফিসফিস করে গাধার কানে কানে বললো, "সিংহের চামড়া পরে পেট পুরে আলু, মটর, ধান, যব খাচ্ছিলি—কিন্তু কেন যে তার মাথার ভূত চাপলো গলা ছেড়ে ডাকতে গেলি। আর তাতেইতো ধরা পড়ে গেলি বাছা—" এ কথা বলে বণিক মরণাপন্ন গাধাকে ফেলে রেখে চলে গেলো। কিছুক্ষণের মধ্যে গাধাও মারা গেলো ধুঁকতে ধুঁকতে।

যে যেমন তার তেমনভাবেই থাকা উচিত। এর অন্যথা হলেই বিপদ ঘনিয়ে আসে।